দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনার নামকরণে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'লাভ ইন দ্য ডেজ অফ কলেরা' গ্রন্থ-নামটি বাংলায় ব্যবহার করেছি। কারণ, এ ছাড়া এই কাহিনীর আর কোনও নাম হতে পারত না। বলাবাহুল্য, নামে ছাড়া ওই বইটির সঙ্গে এ রচনার আর কোনও সম্পর্ক নেই। অন্তত, থাকার কথা নয়। কেন না, নাম শুনলেও, বইটি এখনও হাতে আসেনি। একই নামের দু'জন মানুষ থাকে। একই নামের দুটি বই। থাক না!

— লেখক

কলেরার দিনগুলিতে প্রেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১। ল্যু শা!

মমতার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল পার্ক সার্কাস সেমেটারির সামনে। ১৬ মার্চ, ১৯৯০। তারপর আর দেখা হয়নি।

সেদিন, তখন রাত ৯টা হবে। বলল, 'তাহলে ওই কথা রইল। এবার তিন মাস পরে আসছি।'

বছরখানেক আগেও ছাড়াছাড়ির সময় বলত, প্রায়ই হাত ধরে, 'এই, কবে আসছ?' 'কাল' যদি আমার পক্ষে আসা অসম্ভব হত, ও বলত, 'আচ্ছা, পরশু তাহলে?'

চলন্ত ট্রামের জানালা থেকে, এমনকি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও, একবার উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিত আমাকে। ছাড়াছাড়ির সময় যেটা নাকি প্রেমিক-প্রেমিকাদের আন্তর্জাতিক রীতি।

সঞ্জয় কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে আসার পর থেকে, দেখা-সাক্ষাতের ব্যবধানটা মমতা ক্রমশই বাড়িয়ে দিচ্ছে। শেষের দিকের অর্ধ-সাপ্তাহিককে টেনে বাড়াল সাপ্তাহিকে। সপ্তাহ পাক্ষিকে দাঁড়াল। তারপর এসেছিল এক মাস পরে। এসে, শেষ দিন, ওঠার আগে, হঠাৎ ওই প্রস্তাব রাখল। যে, এরপর তিন মাস।

এক মাস আগে, ১৬ ফেব্রুয়ারি এসেছিল ঠিক দু'ঘণ্টা দশ মিনিট দেরি করে। মুখটুক লাল। শীতের রাতে রগের কাছ থেকে নেমে আসা দু'ফোঁটা ঘাম। নিঃসন্দেহে ছুটেই এসেছে কিছুটা পথ।

কিড স্ট্রিট-ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এই প্রশস্ত চীনা রেস্তোরাঁটির নাম ওয়ান-টান। এখানে ভিড় হয় শুধু লাঞ্চ আর ডিনারের সময়। খদ্দের বেশিরভাগই এ অঞ্চলের সস্তা হোটেলবাসী বিদেশি ট্যুরিস্ট। বাকি সময়ের নির্জনতার জন্য, এবং চেনা লোকজন এখানে এসে-পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বলে, আমরা আজকাল শুধু এখানে দেখা করি। রাস্তা দিয়ে আগের মতো পাশাপাশি হেঁটে আসি না দু'জনে। আমি বা মমতা একা-একা আসি। এবং, যে আগে আসে, অন্যের জন্যে অপেক্ষা করে। বিলকুল নেই-কোথাও থেকে সঞ্জয়কে মাঠে নামিয়েছে মমতা। খেলার স্ট্র্যাটেজিও বদলে গেছে।

দু'ধারে সারি সারি চেয়ার-টেবিলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে এসে, এক প্রান্তে আমার কাছাকাছি পৌঁছে মমতা বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি চলে যাওনি?'

'ছ'টা অবধি দেখে, উঠে যাব ভেবেছিলাম। তারপর ভাবলাম, 'আরও দশ মিনিট বসি।'

'বলেছি তো। ঠিক একঘণ্টা দেখবে। না এলে বুঝবে সঞ্জয়।'

'একঘণ্টা তো কখন হয়ে গেছে। তুমিই বা এলে কেন?'

'এলাম!' মমতা বলল, 'কোনওক্রমে। নাও, ওঠো!'

বলতে বলতে, কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে, আমার পাশের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল। ছোট পটে চা দিতে বলল।

'আজ কী হল, বলো।'

'আজ কিছুই হল না।' মমতা বলল, 'খালি মনে হচ্ছিল তুমি বসে আছ। এদিকে সঞ্জয়ও ছাড়ে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে তো, না এলেই পারতে।'

'যাঃ। তুমি বসে আছ।'

'কিন্তু, দু'ঘণ্টা পরে আমার তো থাকার কথা নয়।'

'ছিলে তো!'

মমতা আলোচ্য বিষয়ের সারমর্ম জানায়। কিন্তু তারও ভাব-সম্প্রসারণ হয়। আমি বলি, 'আমি ভাবলাম, যদি ঘণ্টা দুই পরেও আসো এবং আমাকে না দেখতে পাও— তোমার আসাটা মিথ্যে হবে।'

'তাহলে তো', মমতা ফের উপসংহারে চলে আসে; অঙ্কের উত্তর-মেলা তৃপ্তির সঙ্গে বলে, 'ঠিকই হয়েছে।'

আজ একটু স্পেশাল দেখাচ্ছে মমতাকে। খুব সূক্ষ্মভাবে একটু বেশি সাজগোজ। সাদা শাড়ি পরে এই প্রথম। ওর নখগুলো। মরা সোনা রঙের টাটকা পালিশ। নিখুঁতভাবে ম্যানিকিওর করা। ঠোঁটে লিপগ্লস। সঞ্জয় কি আজ ওকে চুমু খেয়েছে?

'তারপর? আজ কী হল বলো?'

'আজ একদম এনজয় করতে পারলাম না। সঞ্জয় বারবার জিজ্ঞেস করছিল, কী ব্যাপার, আজ এত অন্যমনস্ক কেন? আমার খালি মনে হচ্ছিল, তুমি বসে আছ।'

'বলেছি তো তোমাকে। এ-রকম ডাবল-অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেলে আমার কথা একদম খেয়াল রাখবে না। এ-রকম ভবিষ্যতে হলে জানবে আমি ঠিক একঘণ্টা দেখে চলে গেছি। তখন থেকে তুমি আর আমার কথা ভাববে না।' আমি বললাম, 'সঞ্জয় আগে।'

উত্তর না দিয়ে মমতা কাপে চা ঢালতে লাগল।

'আজ তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?'

'অ্যাস্টরে।'

'অ্যাস্টর? সে তো খুব দামি জায়গা।'

'মনিকো-ফনিকো বলছিল। আমিই অ্যাস্টর সাজেস্ট করলাম।'

'তা, কী হল বলো?'

'হবে আবার কী? একশো সত্তর টাকা বিল।'

'এক। শো। সত্তর?'

'হুঁ। দুটো বিয়ার ছিল যে।'

'তুমিও একটু খেলে বুঝি?'

'পাগল! ভাববে আগেও খেয়েছি। আমি স্রেফ টেংরি কাবাব আর নান আধখানা। তারপর শোনো না! রুমালের জন্যে হ্যান্ডব্যাগ খুলতে যাচ্ছি। ও আমার হাত চেপে ধরে বলল, নো-নো। দ্য প্লেজার ইজ মাইন।'

'তুমি কিছু দিলে পারতে?'

'আমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন কী হয়েছে?'

'নো-নো। নেভার।' মমতা জোর দিয়ে বলল, 'হি শুড পে। মাস্ট পে দ্য প্রাইস।'

'কিন্তু, ঝাড়া ছ'মাস মেলামেশার পরে ওর এই প্লেজার, এ কি পর্বতের মূষিক প্রসব নয়? খালি খানাপিনা করাচ্ছে আর ভিক্টোরিয়া কি হর্টি-কালচারে নিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাঁধবে কবে?'

'একদিন এর মধ্যে ইভনিং শোতে প্ল্যানেটোরিয়ামে নিয়ে গিয়েছিল। বলা হয়নি তোমাকে।'

'সেখানে তো অমাবস্যার রাতও দেখায়। তখন অডিটোরিয়ামে ঘোর অন্ধকার। চন্দ্র-সূর্য কিছু নেই। শুধু আকাশে কিছু তারা।'

'সেদিন তো তাই দেখাল।'

'তখনও কিছু করল না?'

'নাঃ।'

'বলল না?'

'নাঃ।'

'তাহলে, না হয় তুমিই কিছু বলো।'

'আমি? আমি কী বলব?'

'ওই আমাকে যা বলো মাঝে মাঝে। তোমার বাবা-মা অসুস্থ। বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্চে-টাচ্চে... এ-সব না-হয় না বললে। মোটকথা, একটু প্রোভোক কর।'

'পাগল নাকি তুমি? এ-ভাবে তো কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। বিপত্নীক। ৪০। নিঃসঙ্গ। শিক্ষিতা ডিভোর্সি চলিবে।' মমতা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, 'মেয়েদের কখনও আগে অ্যাপ্রোচ করতে আছে? ছিঃ! চিপ ভাববে।'

'না। ছয় পেরিয়ে সাতে পড়ল। এখনও কিছু বলল না। তাই বলছিলাম।' আমি নিরপেক্ষ মতামত জানাই, 'কম দিন তো হল না।'

আজ ওর পরনে সাদা সিফন। সবুজ পাড় যে কালো রঙের শালটা ওর গায়ে, বড়বাজারের শালের আড়ত থেকে কেনা। পছন্দ আমার। বাঁ হাতে কালিম্পঙের ভুতুড়ে পন-শপ থেকে কেনা তামাটে ধাতুর সর্পমুখী বালা, চোখে গালার ফুটকি। সেবার সঙ্গে ছিল নববিবাহিত রণেন আর মান্তু। মান্তুকে লুকিয়ে কিনেছিলাম। মান্তু তখনও মমতার অস্তিত্বের কথা জানত না। একবার সেটার কব্জা থেকে একটা স্ক্রু পড়ে গেল। নিউ মার্কেটের তিব্বতি অ্যান্টিকের দোকান সেটা মেরামত করে দেয়। বলেছিল, এ জিনিস পেলেন কোথায়। এ তো আমাদের গোম্ফার দেবদেবীরা পরে।

'বলবে, বলবে', ডান হাতের কব্জি থেকে তিব্বতি বালাটা ঠেলে তুলতে তুলতে মমতা বলল, 'কে বলবে, আর কে বলবে না, আমরা বেশ বুঝতে পারি। সবাই তো আর তোমার মতো নয়। সে অতি সাধারণ ছেলে, সঞ্জয়। সব বলবে।'

'এত কনফিডেন্স! কিছু আভাস পেয়েছ মনে হচ্ছে?'

'পেয়েছি বৈকি।'

'কিছু বলেছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলেছে বৈকি!'

'কী কী বলেছে?'

'বলল', লম্বা চুমুক দিয়ে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে মমতা, 'বলল, আমার ফিগার ভাল।' বলে সে ভ্রূ নাচিয়ে হাসে। আমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়।

'অ্যাঁ! বলো কী।' আমি উৎসাহে নড়েচড়ে বসি, 'তা হলে তো বহুৎ বলেছে। এক স্টেপ এগিয়ে বলেছে!'

'না তো কী। দশ বছরে তুমি তো এটুকুও বলনি। সঞ্জয় সেদিন বলল— যাকগে! এখন উঠবে?'

'না-না। কী বলল বলো, শুনি।'

'বলল, প্রথম দিনের সেই হাঁস-পাড় সাদা টাঙ্গাইলটা আর একদিন পরে আসতে।'

'কেন, কেন? ওদের পার্টির রঙ তো গেরুয়া।'

'বলল, ওর মা ও-রকম পরত।'

আমি আগে এ-সব লক্ষ্য করিনি কখনও, যে সে কবে কী পরে আসে। আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, আচ্ছা, গত দশ বছরে ও তো অন্তত শ'পাঁচেক শাড়ি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে এসেছে। বেশি না, গোটা পাঁচেকের একটা দূরতম বর্ণনা দাও তো। যাতে শাড়িগুলো, অন্তত আইডেন্টিফাই করা যায়। আমি একটির সম্পর্কেও বলতে পারব না। ওর ব্যাপারে আমি কেবল ভেরি-মেজর এক-দুটো কথাই বলতে পারব, যেগুলোকে কিনা বলা যেতে পারে আমূল পরিবর্তন। যথা, যেদিন প্রথম চড়া-হলুদ কুর্তার সঙ্গে বটলগ্রিন সালোয়ার পরে এল। মোটেই মানায়নি। যদিও মুখে কিছু বলিনি। কিন্তু আর কখনও পরে আসেনি। বা, ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার দিন বাসস্টপে যে-ভাবে এল। আমাকে কিছু না জানিয়ে, পিঠ-জোড়া চাপ চাপ কোঁকড়ানো চুল— ওর আত্মপ্রত্যয়ী নিতম্বের সবটা ঢেকে যেত যেদিন আসত খোলা চুলে— চুলগুলো মাত্র ঘাড় পর্যন্ত রেখে, বাকিটা রাতারাতি খুন? অথচ, কেমন অকুতোভয়ে এগিয়ে আসছে দেখ। যেন, লক্ষ্য করার মতো ঘটেনি কিছুই।

আমার জীবনে ঘটে না কিছুই। কেন না, যা ঘটে আমি তো তখুনি মেনে নেই। তবু বলব, এ-ক্ষেত্রে একটু দেরি হয়েছিল মেনে নিতে।

'পারলে?' আমি ক্ষুণ্ণস্বরে জানতে চাই।

'কেন, কী হয়েছে?'

'কারও পরামর্শ না নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত একা একা নেওয়া যায়?'

'কারও বলতে?' থুতনি বুকে লাগিয়ে তারপর চকিতে মুখ তুলে রীতিমত দৃপ্ত গলায় জানাল, 'আমি কিম-এর পরামর্শ নিয়েছি!'

'কিম? সে আবার কে?'

'টপার্সের বিউটিশিয়ান। অনেকগুলো মডেলের মধ্যে একটা দেখিয়ে আমাকে বলল, এই স্টেপ-কাটটা তোমার মুখের শেপের সঙ্গে ভাল মানাবে। কেন, মানায়নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে সে আমার চোখের ওপর তার চাহনি বিছিয়ে দেয়।

সেই প্রথম আমি জানতে পারলাম, ওর মুখের একটা শেপ আছে। তবে সেটা যে ঠিক কী জিনিস, তা আমি বলতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে কেমন দেখতে আমি তাই আজও জানি না। এ-সব জানে মমতা। লম্বা-লম্বা ভার্টিকাল স্ট্রাইপ দেওয়া শাড়ি পরে এসে একদিন— সিল্ক না তাঁত, কটকি না গার্ডেন, এ-সব আমার মনে নেই— সে-ই আমাকে প্রথম জানায়, 'এতে অপটিকাল ইলিউশান হয়। লম্বা দেখায়।'

প্রথম-প্রথম মেনে নিতে না পারলেও, মনে মনে পরে স্বীকার করেছি এই শেষোক্ত আমূল পরিবর্তনটা ওর পক্ষে খুব খারাপ হয়নি। ওর যে কোনওদিন প্রতিমার পরচুলার মতো শ্রোণি-ডোবানো, পিঠভাসি চুল ছিল একদিন— ক্রমে ভুলেই গেলাম। মাত্র ২৫ বছর বয়সে শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়ে চলে এল মান্তু।

আমাকে মানতেই হবে যে ওর রূপ তার আগে আমার চোখে পড়েনি। ধ্বংস সুন্দরও করে। আমাকে মানতেই হবে, এ-নবরূপে উত্তরোত্তর সুন্দরই দেখিয়েছে মমতাকে।

কিন্তু, গত মাস ছয়েকের কথা একেবারে আলাদা। এখন আমার চোখে পড়ছে অনেক কিছুই। এখন আমি লক্ষ্য করছি আমার কাছ থেকে ওর ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টার ব্যাপারটা যে-ভাবে, কত সূক্ষ্ম ও সতর্কভাবে নিজের সাজপোশাক ও প্রসাধনের ব্যাপারেও সে আমাকে ছেড়ে সরে সরে যাচ্ছে। আমার কাছে যখন আসত, চুলটুল থাকত এলোমেলো। কোনওদিন মাথার ওপর ডাঁই করা, ক্লিপ-টিপ দিয়ে কোনওমতে আটকানো। প্রায়ই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত ঘাড়ে। প্রসাধন কখনও করেনি। নগ্নতা ঢাকা ছাড়া জামাকাপড় পরার আর কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে— সে-সম্পর্কে, মনে হত তার কোনও ধারণা নেই। তখনও ছিল না।

এ-ক'বছর শীত পড়তে না পড়তেই ঠোঁট-ফাটা প্রতিরোধের অজুহাতে প্রথমে লিপগ্লস, তারপর ন্যাচারাল ব্যবহার শুরু করল। সন্দেহ নেই, অচিরেই ল্যাকমে-রঙিন হয়ে উঠবে ওর ঠোঁট দুটি। নখের কথা আগে বলেছি। চুল করতে আজকাল নিয়মিত পার্লারে যায়। মুখ দিনে দিনে ঝকঝক করছে। গালে ব্লাশার। আঁখিকোণে কাজল। দেখতে দেখতে ভ্রূ-র প্রান্তদেশ কত না সূক্ষ্ম হয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত, হাঁস-পাড় সাদা শাড়ি পরে গিয়েছিল কি মমতা?

মমতা ঘাড় কাত করে বলল, 'হুঁউ। কিন্তু আমিও বলেছিলাম, তুমি তা হলে সেই নীল টি-শার্টটা পরে আসবে, যার পকেটে লেখা, ল্য শা। যা প্রথমদিন পরে এসেছিলে। ল্য শা মানে কী জানো?'

'ন্না।'

'বেড়াল। ওটা ফরাসি কথা।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'সঞ্জয় বলল।'

'ফরাসি জানে বুঝি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানে তো দেখলাম। বলল তো।'

'তাহলে ও হয়ত ফ্রেঞ্চেই বলবে, তুমি দেখো।'

'কী-ঈ বলবে?'

'ওই!'

'যা তুমি বলনি?'

'ধর তাই।'

'দেখি! পাঞ্জাবিতেও বলতে পারে।'

'অনেকগুলো ভাষা জানে বুঝি?'

'আর-এ না। ওই যে একটা গান আছে না, আংরেজিমে কহতে হ্যায় আই লাভ ইউ? পাঞ্জাবি, বাংগালি, মাদ্রাজি, গুজরাতি সব ভাষার বয়ানই তো ওই একটা গানে আছে।'

মমতা কুলকুল করে হাসতে লাগল।

'টি-শার্টটা পরে এসেছিল? ল্যা শা?'

'সিওর!'

'হঠাৎ দেওয়াল ঘড়িতে চোখ পড়তে চমকে উঠল মমতা। ও কি সঞ্জয়কে কোথাও বসিয়ে রেখে এসেছে?'

সঞ্জয় কি মমতাকে চুমু খেয়েছে আজ? কিন্তু কোথায়। সিনেমায় গিয়ে থাকলে বলত। মমতা সব বলে। আমাদের সেই রকমই কথা হয়ে আছে। ('তোমাকে সব বলছি, তুমি সব জানছ— এতে অনেক হালকা লাগে।'— মমতা।)

মমতা বলল, 'ওঠো-ওঠো।'

'কোথায়?'

'ওঠোও না!' হাত ধরে টেনে, 'চল যমুনা-য় যাই।'

'কী ছবি?'

'জানি না।' রাগ করে, 'তুমি যাবে কিনা!'

'ছবি তো কখন শুরু হয়ে গেছে।'

কী মনে করে হঠাৎ হেসে ফেলল, সে-ই জানে। একগাল হেসে বলল, 'কিন্তু শেষ তো হয়নি।'

বিষণ্ণভাবে বললে এর একটা মানে দাঁড়াত। কিন্তু মমতা বলল হাসতে হাসতে।

এই প্রথম যে এরকম, তা না।

যখন এমন হয়েছে, দু'গুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ— এক কথায় যাচ্ছেতাই দামে টিকিট কেটে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে সে প্রবেশ করেছে যে কোনও অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে। বিষয়বস্তু দূরস্থান, সে সব ছবির নামও আমরা বলতে পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর যে দিন ফ্লপ ছবি, ফাঁকা হল, আর সব টিকিট পড়ে আছে, বা, যে সব দিন অ্যাডভান্স কেটে রাখতে পেরেছে হিট ছবির টিকিট— কাউন্টারে সিটের প্ল্যান ঝুঁকে এক পলকে দেখে নিয়ে— নিভৃত, নির্জনতম, সিট দুটি বেছে নেওয়ার ব্যাপারে, তার সেই সব করিৎকর্মের তুলনা হয় না। এ সব ব্যাপারে তার জুড়ি বোধকরি এ শহরে দুটি নেই। একটু লজ্জিত হওয়ার অবকাশ কি থাকে না? যে, এত সিট থাকতে, কেন খুকি, এ রোমহর্ষক নির্বাচন! বিশেষত ওইটুকু মেয়ে আর তখন সবে কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছে। নিউ এম্পায়ারে অ্যাডভান্স কাউন্টারের রুপো-চশমা বুড়ো অ্যাংলোটাকে তো পরের দিকে কিছুই বলতে হত না।

মঙ্গলবার সকাল দশটায় অ্যাডভান্স কাউন্টার খুলেই যে একা মেয়েটিকে সে জানালার ওপারে আশা করত, সে মমতা। তখনও মাঝে মাঝে দুটো বেণী করত চুলে। মমতাকে দেখলেই ড্রেস সার্কেলের চারটি সিটের দেওয়াল-ঘেঁষা একেবারে পিছনের সিট জোড়ার কামনাময় উমের ওপর খুদে লাল পেন্সিল দিয়ে বুড়ো অগ্রিম টোকা দিয়ে দিয়ে দেখাত, যে চারটি সিট নিয়ে স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত নাকি তিনদিক-ঘেরা বক্স ছিল। অবশ্য, খালি থাকলে তবেই।

ঘাড় এমনিতেই একটু বাঁয়ে হেলে যায় মমতার, যখন সিদ্ধান্ত নেয়। মাথা কাঁধে রেখে সে যখন সম্মতি জানাত, তখন টিকিট বিক্রেতার নাসিকা-সর্বস্ব হেঁড়ো রোগা মুখের চামড়া সর্বজ্ঞের আবিল হাসিতে যেভাবে ঘুলিয়ে উঠত, একটু লজ্জিত হওয়ার পক্ষে তা কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু সে-সবে পাত্তা দেওয়ার পাত্রীই মমতা না। সেই শুরু থেকেই।

বস্তুত, কলকাতার মলিন ও হতশ্রী হলগুলির মধ্যে, নিশ্ছিদ্র পর্দানশীনতার দিক থেকে, বিশেষত নৈশ দৃশ্যগুলির সময়, নিউ এম্পায়ারের ওই আগে-বক্স-ছিল সিটজোড়া সত্যিই তুলনাহীন। ও সব সিট পেলে, ছবির কি দিনে, কি রাতে, শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত সেগুলি বন্ধ না করলেও চলে।

২। প্রেমের সমাধি তীরে

গত বছরখানেক ধরে সঞ্জয় তপাদার নামে একটি ছেলের সঙ্গে ডেটিং করছে মমতা। প্রথম ছ'মাস, যতদিন বহরমপুরে পোস্টিং ছিল, মাসে দুই কি বড়জোর তিন দিনের বেশি আসতে পারত না। তখনও বাকি সন্ধ্যাগুলি ছিল আমার। এখন, কলকাতায় আসার পর থেকে, সে ওর প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যার দাবিদার।

প্রথম দু'মাস কিছুই বুঝতে দেয়নি। তারপর একদিন হঠাৎ বলল, 'এই শোনো। কাল আমি আসতে পারব না।'

'কেন?'

'আচ্ছা আসব। তুমি একটু আগে আসতে পারবে?'

'কী ব্যাপার। দেখতে আসছে নাকি?'

'দেখতে আবার কে আসবে। ঊনত্রিশ বছরের পাত্রী হয় নাকি?' আঠাশ হলেও কথা ছিল।'

'আঠাশ হয়। অথচ ঊনত্রিশ হয় না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।' মমতা বলল, 'ঊনত্রিশে ত্রিশ শব্দটা লেগে গেছে।'

'দিন ঠিক করো। আমি যাব দেখতে।' মমতা হাসি শুরু করতেই, 'না, না। সিরিয়াসলি।'

'ঊনচল্লিশেও পাত্র হয় না। আটত্রিশ অব্দি চলে।' এবার আমি হাসতে যাব, দেখি মমতা ভীষণ গম্ভীর।

'কী ব্যাপার। অসুখ-বিসুখ নাকি বাড়িতে?'

'না-না। সে সব কিছু না।' এতক্ষণ পা দোলাচ্ছিল। এবার গোটা শরীরটাকেই দুলিয়ে দেয় তার প্রতিপ্রশ্ন, 'ধরো, একজনের সঙ্গে মিশছি?'

'আরে, আরে', আমার উৎসাহ দেখে আমরা দুজনেই একসঙ্গে অবাক, 'এ তো মস্ত খবর। কতদিন ধরে মিশছ? আলাপ হল কোথায়? কে ছেলেটা? কী করে?'

'বলছি, বলছি।' ওর স্বরে একটা নিরুপায় অপরাধবোধের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি, 'আমাদের অফিসের সুরনাথের কাছে এসেছিল। সুরনাথই আলাপ করিয়ে দিল। তারপর সেদিন নন্দন-এ একা পেয়ে পাকড়াল।' সন্ত্রস্ত চোখে মমতা বলল যেন এখনই এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, 'আমি সরে যাচ্ছি। একদম পা ফাঁক করে আটকাল। আমি কী করব?' মমতা এবার ঠোঁট ফোলায়, 'তুমিই তো এলে না সেদিন।'

'বলেছি তো তোমায় সেদিন। মাস্তু... ডাক্তার ডেকে আনতে হল। যাক। তারপর-তারপর?

'তারপর আর কী। বাইরে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে গল্প। আর তোমার জন্যে অপেক্ষা।'

'কার জন্যে ওয়েট করছ জানতে চাইল না?'

'না। তা হলে তখনই কেটে যেতাম। বুঝে নিল একটা কিছু। অবশ্য যেতাম বা কোথায়। তোমার জন্যে অপেক্ষা তো করতেই হত। আর তাই করছিলাম।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে তো দেড়মাস আগের কথা। এর মধ্যে দেখা হয়েছে?'

'তিনদিন।'

'কোথায় কোথায় গেলে?'

'দু'দিন অফিসে এসেছিল। সুরনাথ আমার পাশেই বসে। প্রথম দিন সুরনাথের টেবিল থেকে, দ্বিতীয় দিন আগাগোড়া, প্রায় ঘণ্টাখানেক আমার টেবিলের সামনে বসে কথা বলল। সুরনাথ তখন সিটে ছিল না। লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিল সুরনাথের সঙ্গে। আমি চলে গেলাম তোমার কাছে।'

'এবং আমাকে বিন্দুবিসর্গও বললে না। যাক, তৃতীয় দিন সিনেমায় গেলে?'

'সিনেমায়? এত তাড়াতাড়ি? এ কি হ্যারল্ড রবিনস-এর উপন্যাস নাকি?' মমতা বলল, 'চিপ ভাববে।'

'তা, দেড়মাস হয়ে গেল, তুমি একদম চেপে গেছ?'

'না-না।' কেউ শুনতে পাচ্ছে না, তবু গলার স্বর পর্দা দুই নামিয়ে মমতা বলল, 'সেরকম কিছু নয়। জাস্ট দেখছি। তুমি তো বলেছিলে দু-একটা ট্রাই করতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলেছিই তো।' এবার সস্নেহে আমি ওকে কাছে টেনে আনি। নিজের হাতে কেবিনের পর্দা আরও একটু টেনে দেয় মমতা। যদিও তার দরকার ছিল না। রেস্তোরাঁর এখন লিন পিরিয়ড। সবে বিকেল। লোকজন আসতে সাড়ে সাতটা। জানান না দিয়ে অন্তত এখানে আমাদের কেবিনের পর্দা কেউ তুলবে না, কোনও ওয়েটার। বিশেষত, আজ আমরা বসেছি লী ইয়ং-এর কেবিনে।

সেই যে একবার আমাদের চুম্বনরত অবস্থায় পর্দা তুলেছিল লী, তারপর থেকে মমতা তাকে নিয়মিত পাঁচ, ক্বচিৎ দশ টাকা টিপস দেয়। মালকিন শ্রীমতী হুয়া জানেন, তার অফিসে কোন ফ্লোরে কোন টেবিলে মমতা বসে। ওয়ান টানের দেড় হাজার টাকার টেলিফোন বিল থেকে ভূত তাড়াতে মমতা ওঝার ভূমিকা নিয়েছিল।

এখানে, ওয়ান টানে, আমরা নিয়মিত আসি আজকাল। ইদানীং, এখানে ছাড়া আর কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে না মমতা। এখানে সবাই জানে, আমরা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব। প্রথম ঘণ্টায় একটা স্যুপ। তারপর এক প্লেট চপ স্যুয়ে, আমেরিকান বা চাইনিজ, যেদিন যা। লী দু'ভাগে ভাগ করে দুটি পাত্রে দিয়ে যাবে। ছোট পটে চা। দুজনে দেড় কাপ।

'তারপর? থার্ড ডে-তে কী করলে বলো!'

আজ স্লিভলেসের বদলে একটু ঝোলা হাতা। এর নাম ম্যাগিয়া হাতা। মমতা জানিয়েছে। নইলে আর জানাবেটা কে। তাই জানতে পেরেছি। জামার হাতা তুলে, ওর ডান হাতের মূল থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত আমি একবার ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে যাই। ওর শরীরে আমার সবচেয়ে ফেবারিট জিনিস। এই দক্ষিণ বাহু।

'গত মঙ্গলবার।' মমতা বলল, 'অফিস থেকে বেরিয়েছি। দেখি গেটে দাঁড়িয়ে। একদম মুখোমুখি পড়ে গেছি। সেই পা ফাঁক-করা পোজ।'

'পথ আটকে?'

'প্রায়।'

'বাব্বা। ড্যামড স্মার্ট ছোকরা তো।'

'স্মার্ট না ছাই। শোনো না! আমি বললাম, কতক্ষণ? বলে, অনেকক্ষণ। ভেতরে যাননি কেন? কী বলল, বল তো। বলল, 'বাইরেটা অনেক সেফ'। কেন? উত্তরে বলে কী জানো? গেস সামথিং।'

'কী বলল?'

'বলল, আকাশ তো ভেঙে পড়ে না, তাই বাইরে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।'

ছেলেদের মতো জোরে হেসে ফেলে হাত দিয়ে মমতা মুখ চাপা দেয়, 'কী বোকা-বোকা, না?'

'বাঃ।' আমার বেশ সপ্রতিভই মনে হল তাকে, 'সঞ্জয় শুনতে তো বেশ। দেখতে কেমন?'

'স্বাস্থ্য ভাল।' মমতা সংক্ষেপে বলল, 'তোমার মতো রোগা নয়।'

আমি বললাম, 'সে তো ভাল কথা। গায়ের রঙ?'

'তোমার মতো ফর্সা নয়।'

'লম্বা?'

'তোমার মতো লম্বু নয়। কিন্তু আমার থেকে তো বড়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুখশ্রী?'

'গোঁপ আছে। দু-চক্ষের বিষ।'

'সে নাপতে ডেকে কামিয়ে দিলে হবে'খন।'

'এই', এতক্ষণে মমতা আমার হাত সরায়, 'লী এবার এসে পড়বে।' বলে সে লী আসার আগেই ঘণ্টি মারে ও বোতাম না দিয়ে বুকের ওপর আঁচল টেনে দেয়।

'তারপর? গেলে কোথায় সেদিন?'

'সেদিন ওই এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত হাঁটলাম। তারপর ইন্দ্রমহলে কুলপি খেয়ে বাড়ি। কড়েয়া যাব শুনে বলল, পদ্মপুকুরে ওর কাজ আছে। জানি মিথ্যে কথা। বেকবাগানের মুখে ড্রপ করে দিল।...

অফিস থেকে বেরিয়ে হেস্টিংস স্ট্রিটের চার্চটার সামনে যখন বলল, এর মধ্যে জোব চার্নকের সমাধি আছে। গেছেন কখনও? আমি বললাম, না।'

কলকাতায় চুটিয়ে প্রেম করার জায়গা হিসেবে খ্রিস্টীয় সমাধিক্ষেত্রগুলির মতো সুবিধাজনক স্থান আর নেই। এর মধ্যে ভবানীপুর রোডের সেমেটারিটি অবস্থানগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। রেসকোর্সের সামনে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাস্তাটি ধরে খানিক এগোলেই কয়েক একর এলাকা জুড়ে কবরখানাটি। বেপট জায়গা বলে, ওখানে যাওয়া দূরে থাক, কেউ এর খবরই রাখে না। আমরা ছাড়া বোধহয় খুব একটা কেউ যায়ওনি। অন্তত আমাদের জানা কেউ। কোনও প্রেমিক-প্রেমিকা। যায় না কেন যে। ভূতের ভয়েই কী?

প্রেমিক-প্রেমিকাই বলি। নইলে, এ ছাড়া আমাদের স্ট্যাটাসই বা কী। আমি ওকে ভালবাসি কিনা জানি না। কিন্তু সে তো আমি কারুকে, কোনও কিছুকে ভালবাসি কিনা, তাও জানি না। মাথার ব্যথা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মমতা যে আমাকে ভালবাসে, এবং শাস্ত্রসম্মতভাবে, এতে তো কোনও ভুল নেই?

না। কিন্তু এখন? এখন আর কী। এরপর বড়জোর সে 'আমাকেও' ভালবাসবে। তফাত বলতে হবে তো শুধু এইটুকু? এতে আমার মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ কী থাকতে পারে। আর, আমার দিক থেকে অব্যর্থভাবে প্রেমিকা না হোক, সে যে আমার একমাত্র যৌনসঙ্গিনী এবং সেদিক থেকে সর্বার্থসাধিকাও বটে, এতে তো কোনও ভুল নেই! কোনও প্রতিদান আশা না করে, কোনও ভবিষ্যতের আশা না রেখে, যখন যা যেভাবে চেয়েছি, আমার কোনও কামনাই সে অপূর্ণ রাখেনি। প্রেমিকা না হলেও, আদর্শ মিস্ট্রেস তো বটেই।

তো, এই ভবানীপুর সেমেটারিটি আমাদের একরকম আবিষ্কারই বলা চলে— এবং মমতার প্ররোচনাতেই আমরা একদা সেখানে গিয়ে পড়ি। এজন্যে মনে মনে মমতা বেশ গর্বই বোধ করে। একে তো জন্মসূত্রে গরবিনী, গর্ববোধ বাড়াবার একটা সামান্য ছুতোও যদি সে ছাড়ে!

হয়েছিল কী, আমরা সেদিন যাব জু-গার্ডেনের মধ্যে বিজলি গ্রিল রেস্তোরাঁয়। এয়ারকন্ডিশনড, একবার গিয়ে পড়লে, এই গরমে ওখানকার ফিলিং-ই আলাদা। চারদিকে খাঁচায় বন্দী পাখি, প্রাণী, সরীসৃপ। শুধু আমরাই মুক্ত, স্বাধীন— শুধু আমরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি— এমন একটা ইলুউশান তৈরি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অনেকগুলো খাঁচাই তো খালি পড়ে আছে— রাস্তা থেকে একটা পাগলকে ধরে ওর একটায় পুরে দিলে পারে' চিড়িয়াখানায় পাখি-হ্রদের ধারে বসে মমতা একদিন বলেছিল, 'খেতে-পরতে-ঘুমোতে সবই তো পাবে।'

'পাগলিকেও রাখা যেতে পারে।'

'ঠিক আছে। তা হলে একজন পাগল আর একটা পাগলি। মাঝখানে লোহার জালের দেওয়াল। যেমনটা বাঘ-বাঘিনীর বেলায় থাকে।'

'নেমপ্লেটে লেখা থাকবে আদম আর ইভ।' আমি প্রস্তাব করি।

'যদিও আমরাই হতাম সেরা স্পেসিমেন। ভাগ্যিস, জানে না।'

'আদম আর ইভ?'

'না। পাগল আর পাগলি!'

মমতা হেসে ফেলে।

চিড়িয়াখানায় যাব বলে সেদিন রবীন্দ্রসদনের সামনে দাঁড়িয়ে। বাস আর আসে না।

সেদিন দুপুরবেলা। মার্চের সবে শুরু। রাস্তার পিচ ইতিমধ্যেই গলতে শুরু করেছে। একটু আগে আমাদের সামনে দিয়ে একটা শব মিছিল চলে গেছে। সামনে কাচের গাড়িতে কফিন। মমতা বলল, 'এইটুকু পথ। চল হাঁটি। পথে ট্যাক্সি পেলে ধরা যাবে।'

অন্তত একটা মিনি-ফিনিও তাড়াতাড়ি পেলে হয়। সাড়ে চারটেয় ডিনার টাইম। তার মধ্যে পৌঁছতে পারলে ভাল হয়। ঠিক সাড়ে চারটের সময় চিড়িয়াখানায় সব বাঘ, সিংহ, সব ক'টা চিতা একসঙ্গে ৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের ভুলে যাওয়া স্লোগান দিতে থাকে। গর্জনে গমগম করতে থাকে গোটা জু।

হাঁটতে হাঁটতে আমি লক্ষ্য করছিলাম, নরম পিচের ওপর শবযাত্রীদের কালো কালো পদচিহ্নগুলো। রেসকোর্সের সামনে পর্যন্ত গিয়ে, সহসা বাঁ দিকে ভবানীপুর রোডে ঢুকে গেছে। সেদিকে তাকালে, অদূরে গেটের সামনে শব-শকটটি দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখা যায়। তাকে ঘিরে রৌদ্রজ্বলা, বিমূর্ত শোকজটলা।

জু'র রাস্তা শর্টকাট করার জন্যই সেদিন আমরা ভবানীপুর রোড ধরি— যদিও আগে হাঁটিনি এমন রাস্তার টানও পুরোপুরি অস্বীকার করার নয়। এবং শেষ পর্যন্ত ওই কবরখানায় ঢুকে পড়ি। ওখানে দেখেছিলাম ১৮৪০ লেখা কবরের ওপর ১৯৮২-র ঘুমিয়ে-পড়া শ্রমিক। দেখতে দেখতে আট বছর হয়ে গেল।

সমাধিক্ষেত্রের প্রসঙ্গ উঠলে, পার্ক স্ট্রিটের কবরখানাটির গুরুত্বের কথাও, বলতে হয়। পার্ক সার্কাস কবরখানার মতো (যেখানে মাইকেল) এখানেও অনেক ছোটবড় বাড়ি ঠিকই। তবু এটিকে অতটা বে-আব্রু লাগে না। এখানে ঢের বড় বড় গাছ, যা পার্ক সার্কাস সেমেটারিতে নেই। এখানে অধিকাংশ সমাধিই প্রকাণ্ড। এদের আড়ালগুলি, প্রাচীন বনস্পতির বিশাল গুঁড়িগুলিই এখানকার বৈশিষ্ট্য। দু'জন মানুষকে অক্লেশে ধামাচাপা দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য দিকে বস্তি এলাকার মাঝখানে ভবানীপুর কবরখানার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। তার আশপাশে একটাও দোতলা বাড়ি নেই।

প্রথমদিন ওখানে গিয়ে পড়ে, মোরামের সরু রাস্তা ধরে আমরা অনেক ভেতরে ঢুকে যাই, দু'দিকে ইটের কেয়ারি, এবং একটি কাঁচা কবরের সামনে বসি।

তখনও ফলক বসেনি। কবরের ওপর পোঁতা একটা গাছের ডালে আটকানো একটুকরো হলুদ পিচবোর্ড। তাতে লেখা মৃতের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। ওয়াল্টার ইমাম বাউড়ি বেশিদিন বাঁচেনি। মাত্র ৩১ বছর। সে সাতদিন আগে মারা গেছে।

কবরের ধারে একটি ডালিমগাছ ফুলের ভারে নুয়ে। দেখে মনে পড়ে, এখন তবে বসন্তকালই বটে। নবাগত শবদেহটিকে কবর দেওয়া হচ্ছে প্রায় সাত-আটশো গজ দূরে।

তুলনায়, হেস্টিংস স্ট্রিটের চার্চ-কাম-সমাধিস্থলটি, হাঁটতে হাঁটতে যার প্রতি মমতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সঞ্জয়, সকলের চেয়ে ছোট। যেখানে রয়েছে জোব চার্নকের সমাধি।

এবং অসুবিধাজনক। এর তিনদিক জুড়ে বড় বড় অফিস-বাড়ি। শীতে, ছাদে দাঁড়িয়ে কেরানিরা সারা দুপুর রোদ পোহায়। এটিও একটি পরিত্যক্ত সমাধিক্ষেত্র। এখানে যা কিছু সবই ১৭, ১৮ বা ১৯ শতাব্দীর। বিংশ শতাব্দী এখানে প্রবেশাধিকার পায়নি।

চাকরিতে ঢোকার পর, ওর অফিসের কাছাকাছি বলে হেস্টিংস স্ট্রিটের কবরখানাতেই আমরা গেছি সবচেয়ে বেশি। খোদ ডালহৌসি পাড়ার মরুভূমিতে, উন্মুক্ত এ মৃত্যুপ্রাঙ্গণে চার্নকের সমাধিটিকে কিন্তু একটি মরূদ্যানই বলা চলে। সমাধি তো নয়, বিরাট বাইজেনটাইন গম্বুজ ও লম্বা লম্বা গ্রিসীয় থাম— সব মিলিয়ে এটিকে একটি গোলাকার সৌধই বলতে হয়। এর ভিতরে গিয়ে একবার দাঁড়াতে পারলে, কার সাধ্য বাইরে থেকে কেউ টের পায়! যে, ভেতরে কেউ আছে। প্রবেশকালে, যুগলে দেখলেও, সন্দেহ করার কিছু নেই। কলকাতার জনকের সমাধিস্থল। ঐতিহাসিক আকর্ষণ। আসতেই পারি। এখানেই, সমাধির অন্ধকার অভ্যন্তরে পদশব্দ নিকটবর্তী বুঝে, ফস্ করে একদিন দেশলাই জ্বালাই ও মস্ত বিবর্ণ ফলকটি পড়তে থাকি একমনে। দেশলাই-এর আলোয় মমতাকে সেই প্রথম একেবারে অন্যরকম দেখিয়েছিল।

আর একদিন চার্নকের কবর ঘিরে মুষলধারে বৃষ্টি।

প্রায় আধঘণ্টা থাকতে হয়েছিল নগরপিতার সমাধির গর্ভগৃহে। সেদিন ঘরে বাইরে এমন তুলকালাম কাণ্ড যে মমতা ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'এই কী করছ! কবর থেকে সাহেব উঠে আসবে যে!'

বলতে বলতে উপর্যুপর বিদ্যুতের আলোয় সহসা ঝলমল করে উঠেছিল মৃত্যুসৌধের অন্ধকার অভ্যন্তর। এত পাপ কি ধর্মে সইবে? হুড়মুড় করে মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়বে বলে ভয় হয়েছিল। এর চেয়ে ঢের কম পাপে বাইবেলে বন্যা হয়েছিল।

ভয়ে যেভাবে দু-হাতে গলা ধরে ঝুলে পড়েছিল মমতা, তাতে. যদি তাকে ভেসে যেতে হয়, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার একটা ব্যাপার ছিলই। আসন্ন মৃত্যুভয়ের চেয়ে সর্বগ্রাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগ আর কী। তার শরীর ও মন আর কখনও ওভাবে একাকার হয়ে যায়নি। কোনও অর্গ্যাজমে কোনওদিন যাবে না।

বৃষ্টি থামলে বেরুব, দেখি একটা মস্ত ঢ্যামনা সিঁড়ি জুড়ে শুয়ে। সে উঠে আসতে চাইছে সমাধির দিকেই। হুসহাস করতেই ব্যাটা ল্যাজ তুলে দোপাটি বনে পালাল।

সাহেব হলে হবে কি, চার্নক বোধহয় মাটির হাঁড়িতে রাঁধা ভাতফাত খেত। বেশ ভীতু।

৩। ক্যানাইনের পাশের দাঁতটা

আজ সঞ্জয় মমতাকে চুমু খেয়েছে।

একেবারে শুরু থেকেই শরীরটাকে এত নির্মমভাবে উপস্থিত করেছিল মমতা, যেন শরীরের চেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার আর কিছু নেই। ছাইরঙা ভয়েলের ব্লাউজের ওপর সেদিন ছিল বড় বড় সাদা বোতাম। যা, সে স্বয়ং স্বহস্তে খোলে।

আমার আগ্রহ দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আমি খুলছি।'

'আমি খুললে ভাল হত না?'

'তোমার তো হাত কাঁপছে? কেন, আমি খুললে কী হয়েছে?'

'নিজে নিজে তো' আমি বললাম, 'ডাক্তারখানায় খোলে। মডেলরা খোলে স্টুডিওয়। তখন শুধু সাদা ব্রেসিয়ার পরে।'

'আচ্ছা, নাও, খোল।' সতেজ স্বাস্থ্যে-ভরা শরীরের তুলনায় ওর বেশ ছোট ছোট স্তন। কোনও সঙ্কোচ নেই সেজন্যে। দু'দিকে দু'হাত বিছিয়ে ব্রেসিয়ার খুলতে সাহায্য করেছিল। কে বলবে, ঊনত্রিশ বছরের মেয়ে। এবং এই প্রথম।

চঞ্চল সিগারেট আনতে গেছে। নাকতলায় ওর স্টুডিওয় আমরা তখন। আমাদের চারিদিকে ওর বিখ্যাত 'কলেরার দিনগুলি' সিরিজের বিপন্ন ভয়ার্ত মানুষ। তারা রাস্তায়। তারা গলিতে। তারা গঙ্গার কিনারা বরাবর তাড়া খেয়ে ছুটছে। রঙ ও রেখার ভয়ঙ্কর আক্রমণে তারা দিশাহারা। মাত্র একখানা মেঘের শবাচ্ছাদনে ঢাকা কলকাতার সারা আকাশ।

বা, তারও আগে ওকে প্রথম চুমু খাবার কথাটাই ধরা যাক না কেন। মমতাকে আমি প্রথম চুমু খাই এক অধুনালুপ্ত সাইনবোর্ডহীন তিব্বতি রেস্তোরাঁয়। আমাদের আলাপের দিন সাতেকের মাথায়।

এলগিন রোডের মুখে লক্ষ্মীবাবুর আসল চাঁদির দোকানগুলির মাঝখান দিয়ে আন্ধি গলি। দু'জনে সামনে-পিছনে যেতে হয়। তারই একদম শেষের দিকে ছিল দোকানটি। দোকান নয়, এক দরিদ্র তিব্বতি পরিবারের বৈঠকখানা। মালিকের নাম তামাং দোরজি। তামাং ডকের ঠিকে কুলি। অবিবাহিতা সুন্দরী বোন বোবা বয়ের হাত দিয়ে খাবার পাঠায়। ওখানকার ভাজা বা সেদ্ধ মোমো তাজ বেঙ্গলে পরিবেশিত হবার জিনিস।

আট বাই ছয় কুঠরি। বেঞ্চির সঙ্গে তিনটি টেবিল কোনওমতে। সিলিং-এ আটকানো টেবিল-ফ্যান। এপ্রিলের নিষ্ঠুর গরমে হাওয়ার চেয়ে আগুনই ছড়াচ্ছিল বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মোমো। বাঃ, বেশ নাম তো। একদম পুলি-পিঠে। আমাকে বাড়িতে ডাকে মোমো বলে।' মমতা জানতে চাইল, 'জিনিসটা কী?'

'খাও না। ভেতরে শুয়োরের মাংসের পুর। দারুণ খেতে।'

'আর একদিন খাব। স্যুপটুপ পাওয়া যায় না?'

'কেন? শুয়োরের মাংস খাও না?'

'না-না। তা নয়?' মমতা হঠাৎ জানতে চায়, 'আপনি কোনও ভাল ডেন্টিস্টকে চেনেন?'

'কার জন্যে?'

'আমার।'

'দাঁত? তোমার? তোমার দাঁত-ফাত ওঠারও বয়স হয়েছে নাকি?'

'না, হয়নি?' অভিমানী বিড়ালির মতো সে শরীরের রোঁয়া ফোলায়, 'কাল থেকে অসহ্য যন্ত্রণা। এই যে দেখুন —'

তর্জনী দিয়ে ঠোঁটের প্রান্ত টেনে সে দাঁতটা দেখায়, 'ক্যানাইনের পাশেরটা। গোড়াটা খুব ফুলে গেছে। যায়নি?' সে তার ছাইরঙা চোখের নিষ্পাপ ও নরম চাহনি মেলে ধরে।

স্বাস্থ্যবান লাল-টুকটুকে মাড়ি। সোনার ডেনচারে বসানো মুক্তোর সেট। চোখের কোনায় জল। অনুভবগুলির মধ্যে যন্ত্রণা, রাগ, এগুলো সরল প্রকৃতির। তাই একটু হাসিও লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোনায়।

কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ঠোঁট ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'বোধহয় আক্কেল।'

সে আমাকে পরে বলেছিল, 'বিশ্বাস কর। আমি অনেস্টলি তোমাকে দাঁতই দেখিয়েছিলাম। আমি ভাবতেও পারিনি যে তুমি—'

'যে আমি ডেন্টিস্ট নই?' বলে আমি ওকে হাসাই।

কিন্তু সেদিন একটু পরেই আমি সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছিলাম, 'কী ব্যাপার!'

'কী-ঈ!'

'এই প্রথম নাকি তোমার?'

বোকামিই করেছিলাম। কারণ, ততক্ষণে মমতার ঠোঁটটোট ফুলে ঢোল।

'না তো কি, দ্বিতীয়?' ফোলা ঠোঁট আরও ফুলিয়ে, বালিকার ফ্রকপরা অভিমানে আয়ত ও ব্যথিত দুই চোখ মেলে ধরে সে প্রতিপ্রশ্ন রেখেছিল, 'নইলে, ঠোঁট এত ফোলে?'

কিন্তু বাধা দেয়নি একটুও। কেশর তুলে ঘাড় ও চিবুক তুলে গ্রীবায় চুমু খেতে দিল। ওর শরীরের যতটুকু বিবস্ত্র, সর্বত্র আমাকে চুম্বন করতে দিল। তারপর, মাথা নিচু না করে, নিজের কোলের ওপর হাতদুটো রেখে বসে রইল কিছুক্ষণ। যদিও হতভম্ব ভাবে।

তারপর, ওর স্যুপ এলে (এখানে স্যুপের নাম থুপ্‌পা), চামচে করে তুলে সে লম্বা চুমুক দেয়। স্যুপের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে ফের জানতে চায়, 'আপনি চেনেন কোনও ডেন্টিস্টকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪। কলকাতার ওফেলিয়া

সঞ্জয়, মমতাকে চুমু খেয়েছে 'ম্যাড-ম্যাক্স-টু' দেখতে গিয়ে। নিউ এম্পায়ারের সেই আগে-বক্স-ছিল সিটজোড়ার একটিতে? না, টিকিট সঞ্জয় কেটেছিল। ড্রেস সার্কেল পায়নি। কিন্তু সেজন্যে বিন্দুমাত্র বা কোনওরূপ অসুবিধেও হয়নি।

যতদূর জানা গেল, আমার মতো যত্রতত্র ও অসংখ্য নয়, শুধু ঠোঁটে দম-বন্ধ-করা মাত্র একটি চুম্বনেই সে বিশ্বাসী। ('ঠোঁট নয়, মনে হচ্ছিল যেন টুঁটি ধরেছে'— মমতা) 'আই ক্যান বি হটার ইন বেড'— এই ভাষায় উত্তর-চুম্বনপর্বে সে জানিয়েছে তার প্রেম। এ রকম ইংলিশে।

'শেষ পর্যন্ত তাহলে বলল। এবং ইংরেজিতে', আমি বললাম, 'যাক, ভাগ্যিস ঘরে হয়নি ব্যাপারটা।'

'কেন ঘরে হলে কী হত?'

'তাহলে আঁচড়ে-কামড়ে ছেড়ে দিত না। সবটা খেত।'

'উঃ! অম্নি দিচ্ছি খেতে। বিয়ের আগে ও-সব হবে না। সঞ্জয়ের সঙ্গে।'

সিনেমার আগে ওরা গিয়েছিল মিডলটন রো'র সেহ্‌নাজে।

'আর কোথায় যাই বলো তো? পার্ক স্ট্রিট কি থিয়েটার রোডে ওই দু-একটা জায়গাই তো পড়ে আছে যেখানে তোমার সঙ্গে যাইনি। এত বছর ধরে সর্বত্র তোমার সঙ্গে গিয়ে গিয়ে, তারপর হঠাৎ আর-একজন মমতা বিব্রতভাবে বলল, 'এমন মুশকিল হয়েছে না!'

'তারপর? সেহ্‌নাজে কী হল বলো?'

'ওখানে কী হবে। যা হবার সব তো নিউ এম্পায়ারে হল... হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম', মমতা ভাবনায় পড়ে গেল, 'হ্যাঁ। এই যেমন ধরো, এখানে আসি যদি কোনও দিন, এই ওয়ান-টানে। পাঁচ বছর ধরে আসছি এখানে। আমার যখন চব্বিশ আর তোমার চৌত্রিশ সেই তখন থেকে। একদিন, সেই গোড়ার দিকে। যখন একদম পাত্তা দিতে না আমায়। একদিন তোমার খুব দেরি হচ্ছে আসতে। ম্যাডাম হুয়া আমার পাশে এসে বসলেন। মিস সেন, হোয়েন আর ইউ টু গোয়িং টু সেটল? কী কাণ্ড করেছি আমরা এইসব কেবিনে, এতগুলো বছর ধরে, সে কি শুধু লী? ম্যাডাম থেকে প্রতিটি বেয়ারা জানে না? এরা কী ভাববে বলো তো, যদি হুট করে সঞ্জয়কে নিয়ে আসি কোনও দিন। তারপর আবার তোমার জন্যেও আসতে হবে। খারাপ মেয়ে ভাববে। তাছাড়া—'

'আমি না হয় আর না এলাম এখানে?'

'তাহলেও তো মুশকিল। ধরো, মোটা লী এসে, সর্বাঙ্গ দুলিয়ে আর হেসে হেসে আর ঝুঁকে পড়ে ও যেভাবে কথা বলে, জানতে চাইল— হাউ ইজ মিঃ রায়চৌধুরি, যখন সঞ্জয় রয়েছে', মমতার চোখেমুখে আতঙ্ক, 'তাহলে?'

তা সত্যি। পূর্বে লোয়ার সার্কুলার, পশ্চিমে চৌরঙ্গি, উত্তরে নিউ মার্কেট বরাবর এবং দক্ষিণে পার্ক স্ট্রিট— এই বিরাট এলাকার মধ্যে খুব কম রেস্তোরাঁতেই আমাদের যেতে বাকি। এর বাইরে মিশন রো'র ইউ-চি, চাঁদনির পিছনে তাই-ওয়া ও কাছাকাছি গুমঘর লেনের মধ্যে ফ্যাট মামি'জ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিচেন প্রভৃতি রেস্তোরাঁগুলিতেও আমাদের প্রক্ষিপ্ত যাতায়াত ছিল। আমরা যেতে যেতে কত রেস্তোরাঁ উঠে গেল।

মায়, নবনির্মিত পাইনউড বা শাহজাদাতেও যাওয়া হয়েছে।

গুণগত দিক থেকে আমাদের প্রধান শর্ত তো ছিল একটাই। যে, উপযুক্ত কেবিন আছে, না, নেই। পথ-চলতি কোনও নতুন সাইনবোর্ড দেখেছে কি, মমতা আমাকে পরিদর্শনে পাঠিয়েছে। আমি একা গেছি। দেখে এসেছি। যেমন, মার্কুইস স্ট্রিটের নতুন রেস্তোরাঁ, 'ইগলু' যেদিন ওপন করল। সাইনবোর্ড দেখেই মুগ্ধ। ইংরেজি ক্যাপিটাল অক্ষরগুলির মাথায় বরফ। দেখে, রাস্তায় একদম দাঁড়িয়েই পড়ল। বলল, 'ভেতরে যাও তো একবার। দেখে এসো, কেমন।'

যদিও কেবিন ছিল না। নীলাভ স্বল্পালোকের ছায়ায় বেসমেন্টের ওই ছোট্ট রেস্তোরাঁটি ছিল নিজেই একটি কেবিন। টেবিলে ছোট ছোট ঢাকা আলো।

এর নাম ইগলু কেন যে। 'তিমির তলপেট' নাম দিলে কি অনেক বেশি বিষয়ানুগ হত না?

কলকাতার প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে সবার্থসাধক রেস্তোরাঁগুলি সম্পর্কে, তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সুবিধাজনক সময় ব্যাপারে, ঘুরে ঘুরে, ঢের তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি। শুধু সময়ই বা কেন। কোন রেস্তোরাঁর কোন কেবিন। কোন বেয়ারা। এ বিষয়ে আমাদের অথরিটি বলা যেতে পারে।

যেমন, একটি মূল্যবান তথ্য হল, কলকাতার মুসলিম রেস্তোরাঁগুলির প্রতিটিতে ঢালাও কেবিন ব্যবস্থা থাকলেও, সেগুলির কার্যত অনির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি। একথা একবাক্যে ঘোষণা করা যায়। এমনকি, খাবার জল-টল সব দিয়ে যাবার পরেও রেহাই নেই। মাত্র আধ ঘণ্টা বসলে, কঠিন পুরুষ কণ্ঠে 'হাঁ বলিয়ে' হেঁকে বেয়ারা বার পাঁচেক পর্দা তুলে দেখে যাবেই। জেলখানায় ফাঁসি লাইনের ওয়ার্ডার যেন শালারা। রোঁদে বেরিয়েছে।

মোটকথা, মধ্য কলকাতার রেস্তোরাঁ-কালচারের ব্যাপারটা আমাদের নখদর্পণে। স্থানাভাবে এখানে মাত্র একটা উদাহরণ দিয়ে আমাদের এ দাবির ন্যায্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে।

যেমন ধরুন, ব্রডওয়ে। ওই মিশন রো আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর মোড়ে যেটা। সকলেই জানেন, এটি একটি বার। কিন্তু সপ্তাহে একদিন, প্রতি বৃহস্পতিবার, এই সেদিনও, ওটি যে একটি রেস্তোরাঁয় রূপান্তরিত হয়ে যেত, একথা ক'জনের জানা ছিল? এই তো, ক'মাস আগেও বৃহস্পতিবার ড্রাই-ডে ছিল বলে মাতালরা ওখানে একদম ঘেঁষত না। তাদের যাওয়ার কথাও না। উল্টোদিকে, ওই দিন যাদের যাওয়ার কথা, শুঁড়িখানা-জ্ঞানে, তারাও ও পথ একদম মাড়ায় না। সপ্তাহে ছ'দিন বেশ্যা, আর একদিন গৃহবধূ। বুঝবে কী করে, যে, কবে কী।

কলকাতার ওয়াকিবহাল প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে বৃহস্পতিবারের ব্রডওয়ে তাই একটি পীঠস্থানরূপে গণ্য হওয়ার কথা ছিল। অথচ, ক'টা কাপ্‌ল সে খবর রাখত?

মিশন রো'র দিকে লাগানো লম্বা গ্লাস-প্যানেলের ধারে কত শীতের সকাল, কত না বর্ষার দুপুর কি গ্রীষ্মসন্ধ্যা আমরা ওখানে বসে থেকেছি। বিশেষত, মমতা চাকরিতে ঢোকার আগের তিন বছর। কখনও ছোট টেবিলে মুখোমুখি। ফুট দেড়েক গদির ওপর কালো চামড়া ঢাকা ভিক্টোরিয়ান সোফা-টেবিলগুলোয় বসার চেয়ে শোওয়ার উপযুক্ততাই ছিল বেশি। আমরা ছাড়া শুখা দিবসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে মরু-উদ্যানে ক্বচিৎ কেউ এসে পড়েছে— কোনও প্রণয়ী জুটি। এক একটা গোটা সারাদিনও আমরা ওখানে কাটিয়ে দিয়েছি। কাচের বয়েমের তলায় পড়ে থাকা দুটি ভুলে যাওয়া বাদামের মতো। শুধু দু'জনে।

তারপর একদিন, বৃহস্পতিবার ড্রাই-ডে উঠে গেল। সাপ্তাহিক গৃহবধূ নাম লেখাল বেশ্যার খাতায়।

শুধু ড্রাই-ডে'র ব্রডওয়ে কেন, আরও কত ওয়েসিস, আমরা যেতে যেতে, এভাবে শুকিয়ে গেল। ইং-পিং, ইগলু, ফ্যাট মামি'জ, রাইজিং সান, থ্রি সিসটার্স.... এরা সব। ফ্যাট মামি'জ গেল মরে।

৫। 'বাতাসে তুলোর বীজ, তুমি কার?'

চুমু খেয়ে, সেই যে বহরমপুর চলে গেল সঞ্জয়, তারপর দু'মাস দেখা নেই। আবার, হোক দু'মাসের জন্যে, মমতা আমার।

'চিঠিপত্র দেয়?'

'ঠিকানাই জানে না।'

'কেন?'

'দিইনি বলে।'

'এখনও দাওনি।'

'এখনও দিইনি।'

'অফিসে দিতে পারে?'

'একদিন ট্রাঙ্কল করেছিল।'

'অফিসে?'

'হুঁ।'

'কী বলল?'

'বলল, মন কেমন করছে। চিঠি দিতে বলল।'

'দিয়েছ?'

'না।' মমতা উদাসীনভাবে বলল, 'জুলাইতে কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে আসছে।'

তার মানে, আমি চট করে বুঝে নিই, ঠিক দু'মাস। আমার মুখের ওপর দিয়ে মুহূর্তের বিবর্ণতা খেলে গেল কী? সম্ভবত না। কিছু কিছু মুখ আছে যেখানে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে না। আমার মুখ সেই জাতীয়। কিছু কিছু নদী আছে যাতে জোয়ারভাটা খেলে না। সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

তবে আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। অ্যাস্টরে বিল পেমেন্টের ছলে হাত ধরতে সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগলেও, তার সাতদিনের মধ্যে সিনেমায় নিয়ে গিয়ে যে টুঁটি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরা চুমু খায়, তার তো খুব একটা না-লায়েক ছোকরা হওয়ার কথা নয়। চিতা পৃথিবীর দ্রুততম প্রাণী। হরিণের পাল দূরে চরে বেড়ায়। গাছের গুঁড়ির ছায়ায় সে চুপটি করে ঝিমোয়। কী ব্যাপার! আজ কি তার ক্ষুধামান্দ্য? তা নয়। আসলে, সে জানে, তার গতিদিব্যতা শুধু প্রথম দুশো গজের জন্যে। তার বেশি হলে হরিণ। সিনেমায় চুম্বিতা হয়ে মমতা নিঃসন্দেহে সেই দুশো গজের মধ্যে এসে গেছে।

কিন্তু, এসব ভাবনার কোনও প্রতিচ্ছবি আমার মুখ-চোখে ধরা পড়ে না।

আমি বলি, 'তাহলে এ-ক'দিন রোজ এসো।'

'হ্যাঁ। আমি তাই ভাবছি। রোজই এ-ক'দিন মিট করব আমরা।' মমতা আগ্রহের সঙ্গে সম্মতি জানায়।

'আমি অফিস থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এখানে চলে আসব। এই...' মাথা নিচু করে, 'একদিন খালিদা ম্যানসনে যাবে?'

'কোথায়?'

'সেই যে খায়রু প্লেসের বাড়িটায়। চঞ্চলবাবুকে বলো না?'

'ওখানে খারাপ মেয়েরা যায়।'

'অপর্ণাদি লাভারকে নিয়ে কোথায় যায় খোঁজ নেব?'

'উনি হিন্দুস্তান ফানে যান। তাজেও যেতে পারে।'

'আমরা পারি না?'

'না।'

'কেন?'

'ওখানে রিলেশন জানতে চাইবে।'

'ওদের কাছে চায় না?'

'না।'

'কেন?'

'ওদের চেনাশোনা আছে।'

'ও।' চুপসে যায় মমতা, 'তাহলে থাক।' পরমুহূর্তে উৎসাহে জ্বলে ওঠে, 'তাহলে, চলো ডায়মন্ডহারবার যাই।' বলে সে আমার হাত ধরে রাখে হাতে।

মনে হয় কোথাও যেতে যেতে আমি হঠাৎ থেমে গেছি। তাই, সেও গেছে থেমে।

ডায়মন্ডহারবারের হোটেলগুলো ভাল। বিশেষত হোটেল উর্বশী, যেটায় আমরা একবার মাত্র গিয়েছি। বাসস্ট্যান্ড থেকে আধ মাইল দূরে ছোট একতলা হোটেলটি। একেবারে একটেরে। পিছনে অনেকখানি ধানজমি। তারপর বাঁধ। উঁচু বাঁধের ওপারে শুধু নৌকোর পাল বা স্টিমারের ধোঁয়া দেখে বোঝা যায়, তাহলে নদী। ওখানে খাতায় নাম লিখতে হয় না। সম্পর্ক কী জানাতে হয় না। কিন্তু মমতার জন্যে কলকাতায় ফিরতে হবে পাঁচটার বাসে। সাড়ে আটটা, বড়জোর ন'টার মধ্যে তাকে বাড়ি ফিরতে হয়। যেতে আসতে ঘণ্টা পাঁচেক বিছানার জন্যে, স্নান-খাওয়া বাদে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হার্ডলি একঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। অথচ, সেইজন্যেই তো যাওয়া। সেবার তো জোকা পেরোতেই বাস খারাপ। স্নান-খাওয়া সারতে চারটে। ফেরার বাস পাঁচটায়। বিছানায় যাওয়ার সময়ই হল না। সত্যি, পোষায় না। ঊর্বশীর ছোট্ট অ্যাটাচড বাথে দু'জনে মিলে আমার ধারাস্নান প্রস্তাবে মমতার সলাজ সম্মতি— সে অবিস্মরণীয়তার কথা ভেবেও না।

মমতা 'স্বাস্থ্য-ভাল' সঞ্জয়ের সঙ্গে মিশছে আমার জ্ঞাতসারেই। আমি চাই ও সুখী হোক, ওর সংসার হোক। চঞ্চল বলে, আমি এতে মুক্তিই পাব। একা, আত্মমুখী, নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে পারব। আমি যা। এতে দু'জনেরই ভাল হবে।

কিন্তু, মমতা যখন এখনও এভাবে ডাকে, ডায়মন্ডহারবারের ডাক দেয়, তখন মনে হয়, সঞ্জয় বলে কেউ নেই। কেউ ওকে চুমু খায়নি। কেউ ওর হাত ধরেনি। ও যখন এভাবে বলে, মনে হয় ওর ওপর এখনও আমার একছত্র অধিকার। যতদিন বেঁচে থাকবে মমতা, যে অবস্থানেই থাকুক, সঞ্জয় কি ধনঞ্জয়, যাকে পারে স্বামী বানিয়ে, বাবা বানিয়ে, বা, যদিই বিধবা— ডায়মন্ডহারবারের স্মৃতি ওর মন ও শরীর থেকে কখনও মুছে যাবে না। বা, জোব চার্নকের সমাধিগম্বুজ ঘিরে নেমে আসা সেই ঝড়-জলের বিকেল।

৬। নক্ষত্রখচিত, সমুদ্রমেখলা, বায়ুস্তনিত এ পৃথিবী

'তুমি একটা ঘর দ্যাখো না। আমি তো বলেছি তোমাকে আমার কোনও আপত্তি কোনও দিন ছিল না।' মমতা আমাকে বারবার বলেছে, 'এ বড় শহরে তুমি একটা ঘরের সন্ধান করতে পারলে না, তা আমার কী দোষ?'

ঘর। সত্যি কথা বলতে কী কলকাতা শহরে না-বিবাহিত সঙ্গম করার জন্যে এ জিনিসটি পাওয়া বেশ কঠিন। কিড, রয়েড বা লিনটন স্ট্রিটের হোটেলগুলোয় যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে গেলে একটি অব্যর্থ রিলেশন লাগে। বাবু ও বেশ্যা। নইলে, মিউজিয়ামের মুখ থেকে ক'গজ রাস্তা? ওইটুকু পথের জন্যে মেয়ে নিয়ে উঠলেই রিকশওয়ালা পাঁচ টাকা চায়। হোটেল কাউন্টার তাকে টিপস দেয় আরও পাঁচ টাকা। কেন? মমতাকে কেউ বেশ্যা ভাববে, এটা ভাবতে পারি না।

বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে যেখানে যাও, কেওয়াড়ি বন্ধ। এমনকি চঞ্চলের বাড়িতেও না। ওর স্টুডিওয় চুমুটুমু পর্যন্ত চলেছে। কিন্তু বিছানা? মা-বোন রয়েছে। দাদা-বৌদি আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে।

কলেজের বন্ধু সোমেশ্বর। বৌবাজারের অক্রুর দত্ত লেনে বিশাল চারতলা বাড়ি। বউ-বাচ্চা নিয়ে সাঁ করে লিফটে চারতলায় উঠে যায়। বাকি তিনটি ফ্লোরের কথা মনেও থাকে না। তারও হরেদরে ওই এক কথা।

একদিন খুব মদটদ খাওয়াল লেক ক্লাবে নিয়ে গিয়ে। খালি কলেজের গল্প। অবিনাশ তোর মনে আছে? অবিনাশ তুই ভুলে গেছিস? আমার একবর্ণও মনে নেই। তারপর যখন দু'জনেরই মনে হল কলকাতায় আমাদের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কেউ নেই— তখন মরিয়া হয়ে প্রস্তাবটা রাখলাম। তিনতলায়? যাঃ, ওখানে তো একটা হলঘর শুধু! আগে নাচগান হত। পূর্বপুরুষদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেন্টিং রয়েছে। দোতলায়? দোতলায় তো বৈঠকখানা। আর লাইব্রেরি। বিলিয়ার্ড ঘর। ওখানে বেডরুম কোথায়? কিন্তু বৈঠকখানায় সোফা-কৌচ আছে! কী যে বলিস তুই, ডলি কিছু মনে করবে না, সেরকম মেয়েই নয়। কিন্তু ঝি-চাকরদের কী কৈফিয়ত দেবে বল তো? আমি একতলার কথা আর তুলিনি। ওখানে অন্তত একটি ঘরে থাকে ওর প্রকাণ্ড, বাঘের মতো, সুইশ কুকুর— সেন্ট বার্নার্ড। ঘরটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত।

চেনাশোনার মধ্যে যারা শুধু হাম-তুম, ঝি-চাকর নেই, এমনকি বউটিও বাঁজা, যারা দু'জনেই কাজে বেরোয় এবং সারাদিন যাদের ফ্ল্যাট বে-ফিকির খালি পড়ে থাকে— যারা, যখন ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে, মনে হয়, শুধু আত্মীয়স্বজন নয়, মা-বাবা-ভাই বোন নয়, বুঝি গোটা দেশ ও জাতির মুখের ওপরেই তারা ফ্ল্যাটের দরজাটি দড়াম করে বন্ধ করে দিল— আমি জানি, সেখানেও যে কল্কে পাব, সে আশা দুরাশা। কারণ, সেখানে স্বয়ং নারায়ণী শিলা রয়েছেন। অর্থাৎ, বাঁজা বউটি। জেলাসি। জেলাসি ছাড়া কী। যে, আমরা বৌরা শালা স্বাধীন শরীরের মালিকানা বেচে ঘর পেলাম, বেছনা পেলাম... আর তোমরা কিনা, অ্যাঁ, হ্যাঃ, হুস!

ফলত, কলকাতার পথে পথেই আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ দশ বছর। রেস্তোরাঁ থেকে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঠোঁট চোষা আর মমতার বুকের মাংস ঘাঁটাই সার হয়েছে। কলকাতার অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহগুলির অবদান হয়ত আরও কিছু বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হল, সে আর কতটুকু? যাঁহা বাহান্ন, তিপ্পান্ন কি সেখান থেকে ঢের ঢের দূরে?

অথচ, বিশেষত ভাদ্র-আশ্বিন মাসে নগরের রাজপথে জনপথে সঙ্গমরত কত অপরাজ্মুখ কুকুর-কুকুরী। তাদের কেউ কিছু বলে না। তাদের আইন নেই, তাই অপরাধও নেই। তাদের ঘরদোরের প্রয়োজন নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে, যত্র ও তত্র, তাদের স্বাধিকারপ্রমত্ত, সচ্ছল প্রণয়লীলা। অন্ধকার অপরাধকক্ষের খোঁজে শুধু আমাদের যেতে হবে সুদূর ডায়মন্ডহারবারে!

এই তো গত বছরেই। মহালয়ার দিন। সঞ্জয় তখনও স্টেজে নামেনি।

'এবার কোনও কাপ্‌ল দেখলে?'

'কাপ্‌ল? কোন কাপ্‌ল?'

'ওই আর কী!' বলে আমি অর্থপূর্ণভাবে হাসি।

'হ্যাঁ-আ।' সারা মুখ হাসিতে ভাসিয়ে মমতা বলল, 'দেখলাম তো।'

'কবে দেখলে?'

'এই তো। দাঁড়াও বলছি। রবি, শনি... হ্যাঁ, শুক্রবার।'

'কোথায় দেখলে?'

'অফিসের ছুটির পর। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখি, বিবাদি বাগের কোনটায়, যেখানে ওই বিজ্ঞাপনটা রয়েছে না জনসন অ্যান্ড নিকলসনের— হোয়েনএভার ইউ থিঙ্ক অফ কালার... থিঙ্ক অফ মি— ঠিক ওর নিচে।'

'আর তুমিও' সর্বহারার হতাশা আমার গলায়, 'বাসের পর বাস ছেড়ে দিয়ে পুরোটা দেখলে!'

'দেখতেই পারতাম। বাসস্ট্যান্ড। কে বুঝছে কী দেখছি।' মমতার দু'চোখ দিয়ে আলো ভেঙে পড়ে. 'কিন্তু তুমি বসে আছ। তাই হল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুকুর-কুকুরীর সঙ্গম আমি শেষবার দেখেছিলাম বছর দুই আগে। কাশীপুর মহাশ্মশানের সামনে। যখন মাকে নিয়ে যাই। শবদাহের জন্য কাঠ বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে আছে পুরনো প্রবেশদ্বারের সামনে। তারা প্রণয়রত ছিল সেই লরিটার ছাদের নিচে, পিছনের টায়ারের ধারে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। যদিও, মা-র মৃতদেহ কাঁধে যেতে যেতে মাত্র একঝলকই আমি দেখি।

রাতভর ঘর বা পেশাদার বিছানা-অভিজ্ঞতা না থাকলেও, শুয়ে সঙ্গম করার অন্তত একটি গল্প আমাদের আছে, যা বলার মতো।

সেদিন হয়েছিল কী, তখন সন্ধেবেলা। জিওলজিকাল সার্ভের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি, গেট জুড়ে নীল কাপড়ের ওপর সাদা হরফের ব্যানার: তিনদিনব্যাপী ভূতত্ত্ব প্রদর্শনী। সময় বেলা ৩টা হইতে রাত সাড়ে ৮ ঘটিকা। আয়োজক, জি-এস-আই। ভারত সরকার।

দোতলায় উঠেই সামনের হলে সারি সারি গ্লাস-কেস। তারমধ্যে পৃথিবীর নানান জাতের যাবতীয় পাথর-খণ্ড— গ্রানাইট, স্যান্ডস্টোন, স্লেটপাথর, মার্বেল, ক্রিস্টাল, কষ্টিপাথর— এরা তো আছেই। চুনী, পান্না, নীলা, বৈদুর্য, হীরে এ-সবও রয়েছে। রয়েছে কুড়ি হাজার বছর আগের জীবাশ্ম এবং কয়েকটি প্রাকৃতিক মানচিত্র। একটি ফিকে লাল ছোট পাথরের সঙ্গে লেখা 'লোটাস স্টোন'। মমতা বলল, 'নিশ্চয় পদ্মরাগমণি।'

দর্শক জনা পাঁচ-ছয়। বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনাই পেলাম আমরা। একজন যুবতী, জিওলজিস্ট গাইডের ভূমিকা নিয়ে আমাদের ছোট্ট কিন্তু মূল্যবান প্রদর্শনীটি ঘুরিয়ে দেখাল।

ফেরার সময় রাস্তা পর্যন্ত সরাসরি, প্রশস্ত সিঁড়িশ্রেণীর মুখে আমি একবার থমকে দাঁড়াই। এখান থেকে বাঁ-দিকে সার্ভে অফিসের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার খোলা দরজা। ওপারে অন্ধকার ঘর। না জানি আরও কত কক্ষ ও কক্ষান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে এই মুক্তদ্বার, বন্ধ না থেকে, আজ এমন অনিরুদ্ধভাবে খুলে আছে!

আমি মমতার হাত তুলে ঘড়ি দেখি। প্রদর্শনী শেষ হতে এখনও পঁয়ষট্টি মিনিট। সিঁড়ির নিচে টুলে উর্দি পরা দারোয়ান খৈনি পিষছে। তার মাথা নিচু।

মুহূর্তে বাঁ-দিকের অন্ধকার খোলা দরজা আমার চোখের সামনে পরিণত হয় বিশ হাজার বছর আগেকার একটি বর্তুল গুহামুখে। কোমরে উঠে আসে নব্য প্রস্তর যুগের বল্কল। হাতে পাথরের কাঁটা-মারা গদা।

'এসো এদিকে' বলে মমতার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আমি গুহামধ্যে প্রবেশ করি। বাধা দিলে আমি নিঃসন্দেহে ওর চুলের মুঠি ধরতাম।

প্রথম ঘরটি বিশাল। আকাশযানে মাধ্যাকর্ষণহারা, ধীরগতি অ্যাস্ট্রোনাটদের মতো আমরা অন্ধকার সাঁতরে এগিয়ে যেতে থাকি। অগণন টেবিল-চেয়ারের অনুমেয় বাধা পার হতে হতে নিজেদের পথ নিজেরা তৈরি করে এগিয়ে যাওয়ার মহৎ উপলব্ধি আমাদের মনে জাগে।

দ্বিতীয় কক্ষটিতে ফিকে অন্ধকার। এখান থেকে তৃতীয় ও শেষ অফিস ঘরটি দেখা যায়।

ওখানে, রাস্তার হ্যালোজেন আলো বিশাল কাচের জানালা দিয়ে এসে একটি ঘোরানো সিঁড়ির অর্ধাংশ আলোকিত করে রেখেছে। অন্ধকারের ওপারে বিধাতার অলৌকিক শিল্পনির্দেশনা ও অনির্বচনীয় আলোকসম্পাতে তৈরি এক বিমূর্ত মঞ্চস্থাপত্য মনে হয়, দূর থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেক অভিযানেরই একটা সমাপ্তি রেখা থাকে। আবার, সব অভিযানেই থাকে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে আরও এগিয়ে যাওয়ার হাতছানি। মমতা ভাবতেও পারেনি এবং আমিও জানতাম না, লোহার সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি ওকে ওপরে উঠতে বলব। কিন্তু অন্ধকারে ঘরের পর ঘর হাতড়ে আমরা এতদূরে চলে এসেছি যে এখন আর এখান-ওখান বলে কিছু নেই। নিষিদ্ধ এলাকা বলে কিছু নেই। এখন আমরা সর্বত্র যেতে পারি।

মানুষ খুন করতে যাওয়ার সতর্কতায় ঘোরানো রেলিং ধরে মমতা আগে আগে ওঠে। পিছনে আমি। আমরা একটা মেজেনাইন ফ্লোরে পৌঁছে যাই।

এবার? এখন আমরা কোথায়, বোঝার জন্য আমি ফস্ করে দেশলাই জ্বালাই। যা, মমতা সঙ্গে সঙ্গে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। সেই ক্ষণিক আলোয় দেওয়ালের ব্র্যাকেটে টাঙানো জিওলজিক্যালের সারি সারি মানচিত্র আমি দেখতে পাই।

আমি আজও স্বীকার করব এবং বরাবর করেছি, যে, মমতা সেদিন একটুও ভয় পায়নি। অবশ্য, প্রকৃত ভয় তো ভয়াবহতা কেটে যাওয়ার আগে নয়।

বরং, সেই ঈষদুচ্চ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরম প্রাপ্তির মতো সে আমাকে বুকে টেনে নেয়। ও, সুদীর্ঘ শ্বাসরোধী চুম্বন করে।

মেঝেয় ধুলোর নরম কার্পেট। তার ওপর একটি বড়সড় মানচিত্র নামিয়ে চাদর হিসেবে আমরা পেতে দিই। তার ওপর কত স্থান ও সময়চ্যুতভাবে শরীর বিছিয়ে দিল মমতা। যেন, চিতাবাঘিনী জন্মাবার আগেও যেন সে ছিল।

নব্যপ্রস্তর যুগের অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরে।

সিঁড়ির মুখে আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন প্রদর্শনী বন্ধ হচ্ছে। কেউ কিছু বোঝেনি। লক্ষ্য করেনি।

তাড়াহুড়োয় আমার পার্শটা পড়ে যায়। যা খুঁজতে আর একবার ম্যাপ-ঘরে দেশলাই জ্বালাতে হয়েছিল। তখনই এটা জেনে আমরা খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করি ও পরে হো-হো করে অনেক হেসেছি যে, অন্ধকারে, ছয় বাই পাঁচ ফুট যে বিশাল মানচিত্র আমাদের সেদিনের ধূলিশয্যায় বেডস্প্রেডের ভূমিকা নিয়েছিল, সেটি কোনও দেশ বা প্রদেশের ছিল না। তা ছিল সমুদ্রমেখলা, বায়ুস্তনিত, নক্ষত্রখচিত এ পৃথিবীর।

কিন্তু, মমতা বলে, পৃথিবী নয়। আমাদের দরকার একটা ঘর। দরকার একটা অন্ধকার বিছানা। এ-সব বিছানার ব্যাপার।

মমতা একটুও ভুল বলে না।

৭। কলেরার দিনগুলি

পাঠক বুঝতে পেরেছেন আমাদের এই কাহিনীতে আরও দুটি চরিত্র আছে। এরা হল চঞ্চল আর মান্তু। আর একটি চরিত্র অপর্ণাদিরও, যথাদৃশ্যে ভূমিকা নেওয়ার কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান্তু

কাঁকুলিয়া রোডের যে ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে আমি আর মান্তু থাকি, সেটার খোঁজ দেয় চঞ্চল। তার পার্টি-সূত্রে সে-ই সব ব্যবস্থা করে। বাড়িটি ভূতপূর্ব এক মন্ত্রীর। বা মন্ত্রীর নয় ঠিক। মন্ত্রীর পিসতুতো ভাই বা মাসতুতো ভাইপোর, এ-ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে।

ফ্ল্যাট বলতে তিনতলায় ছোটখাটো ঘর একটা। সঙ্গে পাঁচ-বাই-সাত টয়লেট। কল ও শাওয়ার তারই মধ্যে। গ্রিল দেওয়া চিলতে বারান্দায় রান্না, খাবার টেবিল। একটা ইনসেট আলমারি-কাম-ওয়ার্ডরোব। একটা সিঙ্গল বেড। এগুলি এবং প্রত্যেক ভাড়াটিয়াকে কৃতজ্ঞ করার জন্য সকালে এক কাপ চা ও টোস্ট বাড়িভাড়ার অন্তর্গত। দারোয়ান, অফিসে ফোন, ফোনের পাশে কলপ্রতি দুটি টাকা ফেলার বাক্স এগুলি কমন, তৎসহ একটি ছোট্ট বাগান ও কয়েকটি বেঞ্চি। পাঁচতলা বাড়িটির নাম বী-হাইভ রিসর্ট প্রাঃ লিমিটেড। এরকম ৬২টি একঘরা ফ্ল্যাটের বাসিন্দা এখানে ঢোকে আর বেরোয়। বেরোয় আর ঢোকে। চঞ্চল নাম দিয়েছে 'উইটিবি আবাসন'। স্বীকার করতেই হবে, সমগ্র পরিকল্পনাটি একজন একা-মানুষের পক্ষে বেশ সুচিন্তিত, এমনকি, চা ও টোস্টের কথা ভাবলে, রীতিমত পরিশীলিত। ভাড়া নামমাত্র: ১২০০। সাউথ ফেসিং ফ্ল্যাটগুলির জন্য কিছু বেশি, আর সে তো হবেই।

যদি একা থাকা যেত, ঠিক মমতা যা চায়, এবং যতটুকু।

প্রথমদিকে একাই তো থাকতাম। যখন মমতার সঙ্গে পথে-পথে ঘোরাঘুরি শুরু। সম্পর্ক সবে ঘরে প্রমোশন পেয়েছে, এমন সময় রামপুরহাট থেকে রণেন এসে মান্তুকে রেখে গেল। মমতা এসেছে এখানে মাঝেমাঝে। প্রথমদিন আমি তিনতলার ছোট ছাদে রেখে আসার জন্যে চেয়ার তুলতেই মান্তু বলেছিল, 'কোথায় যাচ্ছ, দাদা?'

'ছাদে গিয়ে বোস কিছুক্ষণ। খোলামেলা। ভাল লাগবে।'

কিন্তু, মান্তু ফ্ল্যাটের বাইরে যায় না। আর এটাই তার অসুখ।

রণেন রামপুরহাট কলেজে পড়ায়। মাঝে বারদুই এসেছিল। তারপর আর একবার। তারপর আর আসেনি। ওর শ্বশুরবাড়ির কেউ আসেনি।

আমি আর চঞ্চল অনেক বুঝিয়েছি রণেনকে। রেপ কি হয় না। এজন্যে কি কোনও মেয়েকে দায়ী করা যায়। বিবাহিত পত্নীকে ত্যাগ করা যায়। রণেন তা জানে। সে শিক্ষিত ছেলে। রণেন জানিয়েছে, সে নয়। মান্তুই থাকতে পারছে না।

মান্তুর শ্বশুরবাড়ি মলুটিতে। বীরভূম-সান্তাল পরগনা সীমান্তে বর্ধিষ্ণু গ্রাম, শ্বশুর হেডমাস্টার। শাশুড়ি, দেওর, ননদ, ভাসুর, জা— সব মিলিয়ে জমজমাট পরিবার।

মলুটির কালীপুজো বিখ্যাত। এসময় মলুটির মানুষ দেশের বাইরে থাকে না। দেওর তপেনের সঙ্গে মান্তু পুজোর আগের দিন বাড়ি আসছিল। রণেন কাল আসবে।

বিহার-বাংলার বর্ডার সুরুচুয়ায় সেদিন মলুটির অনেক লোকই দুমকাগামী বাস থেকে নেমেছিল। এসময় মলুটির পুজো দেখতে বাইরে থেকেও কেউ কেউ আসে। তারাও নেমেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন লোক অনেক। কিন্তু, সাইকেল রিকশা দুটি। গ্রামের বেশিরভাগ লোক হেঁটে ফিরছিল।

সুরুচুয়া থেকে মলুটি বেশি দূরে নয়। তবে আজ বাস অনেক দেরিতে এসেছে। পৌঁছতে সন্ধে পেরিয়ে যাবে। সুরুচুয়ায় তপেনের সাইকেল থাকে। গ্রামের লোকের সঙ্গে বৌদিকে ছেড়ে দিয়ে সে এগিয়ে যায়। মলুটি আর সুরুচুয়ার মাঝখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের একটা পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ পড়ে। ভাঙাচোরা রানওয়ের ওপর দিয়ে রাস্তা। অর্ধশত বৎসর আগেকার ভাঙাচোরা ঘর দু-একটা, মায় ওয়াচ-টাওয়ারের ভগ্নাবশেষ এখনও টিকে আছে।

শেষ পর্যন্ত মান্তু বাড়ি পৌঁছয়নি।

ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল মান্তু রানওয়ের ধারে অন্ধকারে একটা কালভার্টের ওপর একা বসে আছে। ভূত চতুর্দশীর অন্ধকারে টর্চের আলোর মধ্যে তার মাথা নিচু। সামনের দিকে চুল উল্টে কালো লম্বা ঘোমটা। তাকে প্রথমে প্রেতিনী মনে হয়েছিল।

জানাজানি হল। কিন্তু পুলিস এল না। পারিবারিক সম্মানের খাতিরে মান্তুর শ্বশুর পুলিসকে জানালেন না।

খবর পেয়ে আমি আর চঞ্চল দু'জনে গিয়েছিলাম। ওরা তখন রামপুরহাটে। দেখলাম, খুব সহজভাবেই মান্তু আর রণেন নিয়েছে ব্যাপারটা। মান্তু সগৌরবে সংসার করছে। ভাবখানা যেন, হ্যাঁ, মাথা ধরেছিল। কিন্তু এখন চলে গেছে। তা ছাড়া, এখানে কেউ এখনও জানেও না ব্যাপারটা।

রণেন বলল, মান্তু অন্ধকারে কারুকে দেখতে পায়নি। তবে সকলেই ছিল খুব কম বয়সী। সকলেই? ক'জন? চারজন। তবে রেপ করে একজন। তার পরনে ছিল ভেলভেট কর্ডের প্যান্ট। বাকি তিনজন অনভিজ্ঞ। তারা মান্তুকে শুইয়ে রেখেছিল। একজন গলায় ধরেছিল ছুরি। মান্তুর মুখে রুমাল গুঁজে দিয়েছিল। তারা পরস্পরের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। কেউ কারও নাম ধরে ডাকেনি। মনে হয়, শহরের ছেলে। মান্তুর দু'হাতের ওপর ছিল দু'জনের বুট।

'ওর সত্যিই কিছু করার ছিল না দাদা।' রণেন বলল গভীর সহানুভূতির সঙ্গে।

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'হ্যাঁ। বোলপুরে। সব ঠিক আছে।' রণেন বলল, 'ও পিল খেত।'

রণেনকে মনে মনে শাবাশ জানিয়ে আমি আর চঞ্চল ফিরে এলাম। এই না হলে শিক্ষিত, আধুনিক ছেলে। তার পার্টি-সমর্থক বলে চঞ্চল বিশেষত গর্ব বোধ করল।

'সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান দাদা', বলে গেল, 'ও পাগল হয়ে গেছে'। তারপর বার তিনেক এসেছিল। তারপর আর আসেনি। সেই রণেন।

সেই যে ঘরে ঢুকল মান্তু, ঘর থেকে আর বেরোয়নি। ঘরে যতক্ষণ থাকে স্বাভাবিক। সব সময়েই তার হাত চলে। পা চলে। কোনও না কোনও কাজকর্মে সে ব্যস্ত রাখে নিজেকে। কিন্তু ঘরের বাইরে পা দেবে না কিছুতেই। এটাই তার অসুখ। এখানে, মমতা আসে না। মান্তুকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ডাঃ পাইনের কাছে মান্তু স্বীকার করেছে, তার স্বামীর আর সব আচরণ স্বাভাবিক। তাকে ভালও বাসে। কিন্তু গত ছ'মাসে সে তাকে একবারও চুম্বন করেনি। তারা পাশাপাশি ঘরে শুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান্তু ঘৃণা করে রণেনকে। রণেন যখন খোঁজ নিতে আসে, শুধু তখনই বোঝা যায় তার মাথা খারাপ। স্তব্ধ প্রস্তরমূর্তির মতো সে বসে থাকে। তখন ঠেলা দিলে পড়ে যায়।

চঞ্চল

চঞ্চলের সঙ্গে আমার চেনা ১৯৭১ সাল থেকে। চঞ্চল আর্ট কলেজে ঢুকেছে। মান্তু ক্লাস থ্রি-ফোরে।

৭০ ও ৮০— এই দুই দশক ধরে আমরা কলকাতায় বেড়ে উঠেছি। যুক্তফ্রন্ট থেকে বামফ্রন্ট। নকশালবাড়ি। চারপাশ থেকে বন্ধুবান্ধবের আত্মীয়-স্বজনের সচ্ছল থেকে সচ্ছলতর হয়ে ওঠা। কত নতুন বাড়িতে যে টেলিফোন এল। তৈরি হয়ে উঠল করিৎকর্মাদের নতুন উপনিবেশ— সল্টলেক। কলকাতায় ফ্ল্যাট-মালিক কালচার। তারপর ৮০-তে অ্যান্টেনায় ছাদগুলি গেল ভরে। নারী একবারের বেশি গর্ভধারণ বন্ধ করল। ধর্মঘট উঠে গেল। শুরু হল ক্লোজার ও লক-আউট। শুরু হল লোডশেডিং। পরিবেশ দূষণের রাষ্ট্রমন্ত্রী পেলেন ক্যাবিনেট মর্যাদা। ৮০-র তরুণ-তরুণীরা, দেখা গেল, কেউ আমাদের ছেলেমেয়ে নয়। তারা আমাদের বিশ্বাস করে না। ৮০-র দশকের প্রান্তে পৌঁছে দেখা গেল, আমাদের সহযাত্রী সমবয়সীরাই আমাদের শত্রু। তারাই আমাদের ঘিরে।

আমাদের আত্মীয়-বন্ধুরা সব গেল কোথায়?

শুধু চঞ্চল টিকে গেল।

চঞ্চল স্ববিরোধে ভরা। ছবি আঁকার ব্যাপারে সে বিশ্বাস করে পিকাসো-মাতিস-গখ-গগাঁ— এমনকি রবীন্দ্রনাথ— এইসবে। ছবির অবয়বধর্মিতাকে সে ঘৃণা করে। ভ্যান গখ একটা হলুদ খুঁজেছে সারা জীবন। মঁদ্রিয়ন শুধু লালেরই শত শত ভাষা ব্যবহার জানত। পিকাসো জানত রেখার আনন্দ। ছবির ব্যাপারে তার আদর্শ এরা, এইসব। কিন্তু রাজনীতি-সমাজনীতি ব্যাপারে মার্কসবাদ তার কাছে আজও অভ্রান্ত। দেশে দেশে সভ্যতার ইতিহাস নতুন করে শুরু হবে সর্বহারার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, সে বিশ্বাস করে। এবং সর্বহারার মতোই, শিল্পীর স্বপ্ন হবে, যা কিছু মূর্ত তার শতশৃঙ্খল থেকে মুক্তি। পূর্ব ইউরোপে যা কিছু হচ্ছে, সবই ইতিহাসের বিচ্যুতি, সে বলে। গর্বাচভ সি আই এ-র এজেন্ট।

আমি এসবের ধার ধারি না। আমার কথা একটাই। সেই গোষ্ঠী-সমাজ থেকে সমাজতন্ত্র পর্যন্ত সমস্তরকম সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্যে ব্যক্তিমানুষের স্বপ্ন আর কামনাকে ছেঁটে চলেছে। সবাই এক একটা জুতো তৈরি করে পা'কে বলেছে তার সাইজ মাফিক হতে। মানুষের সমস্ত বিদ্রোহের উৎস এখান থেকে। এটাই আঁতুড়। যে-জন্যে মানুষের স্বপ্নগুলো আজ জেগে-থাকা। আর জাগরণের গোটা জীবনটা এক অসহ্য দুঃস্বপ্ন। — আমি ওকে বলি।

'এসব তো ফ্রয়েডের বুলি। অ্যাঁ? হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ'

'তুই যা বলিস চঞ্চল, প্রকৃত মার্কসবাদ মানুষের স্বাদ আহ্লাদের কথাটাও নিশ্চয়ই ভেবেছে। বা, ভাববে। তোরা তো সব বড়জোর সিলেক্টেড ওয়ার্কস অফ লেনিন এক-একজন, প্র্যাকটিসে বিশ্বাসী। মার্কস পড়লি কখন?' খালি গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে আমি বলি, 'সেক্স ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবাদী আর সমাজ-অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী— এখানে যে ডায়ালেকটিক্স রয়েছে, প্রকৃত মার্কসবাদ একদিন সে কথাও ভাববে।'

হার্বার্ট মার্কিউজ, অ্যাঁ! দা ইরস অ্যান্ড সিভিলাইজেশান। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ চঞ্চল নতুন পেগে সোডা ঢেলে গ্লাস ঠেলে দেয়, 'নাও। এখন মাল খাচ্ছ খাও। অ্যান্ড ডোন্ট স্পয়েল দ্য ইভনিং, তোমার নিজের কথা বলো।'

আমার নিজের কথা বলতে মমতার কথাও জানতে চায়। মমতা তো চলল। এখন আমি কী করব?

'আমি তো পইপই করে বলেছিলাম তোমাকে, গুরু, ভাঁড়ার কখনও একটা রাখতে নেই। ভাঁড়ার কখনও একটা রাখতে নেই।' আস্তে আস্তে মাতাল হয়ে পড়েছে চঞ্চল। নেশা শুরু হলে এক কথা ও দু'বার করে বলে, 'আজ দশ বছর ধরে একজন ভদ্রমহিলা। একজন ভদ্রমহিলা। তারপর... এখন কী করবে? ডায়োজেনিস হয়ে অন্ধকারে মানুষ খুঁজবে? মান হুঁষ খুঁজবে? হাতে হ্যারিকেন?

হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ চঞ্চল এক ঢোকে গ্লাস ফাঁকা করে বলল, 'তুমি পারো মাইরি!'

চঞ্চল ও মান্তু

মান্তুকে রেপের ঘটনাটা, কত গভীরভাবে ছুঁয়েছিল চঞ্চলকে, সেটা বোঝা গেল গত বছর চিত্ররূপ গ্যালারিতে ওর আটটি বড় বড় ক্যানভাস দেখে। কবে যে আঁকল এসব, বুঝতেই দেয়নি।

সাদা কালো ওর এবারের ছবিগুলোর মারাত্মক দিক ছিল দ্রুতসঞ্চারী রেখার অবিশ্রাম ভাঙচুর ও গড়ে ওঠার মধ্যে প্রগাঢ় লাল রঙের হল্কার অননুমেয় ব্যবহার। কোথাও হ্যাঙারে টাঙানো নারীর চামড়া— শুধু স্তনদুটিতে ভলুম— যা ছোট ছোট স্ট্রোকে ভরা। সেখানে আগ্নেয়গিরির আভা: সামনে সাদা কালো চৌকো টালির মেঝে— তার ওপর পা-হারা হাইহিল লেডিজ জুতো— অগ্রভাগে পাঁচটি মাংসময় আঙুল। একটি ছবিতে দর্শকের দিকে মুখ ব্যাদানকারী রক্তিম সিংহের প্রকাণ্ড ল্যাজ ঘুরে গিয়ে খুঁটিতে বাঁধা নগ্ন নারীর যোনিদেশ পুচ্ছ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আর একটিতে স্বচ্ছ সেমিজ-পরা নারী আর্চ হয়ে চৌকো টালির মোজায়েকের ওপর— তার তলপেটে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা কালো চামড়ার চেয়ার কুশন। প্রতিটি ছবিতেই নায়িকারা মুণ্ডহীনা। সব ছবিতেই তাদের স্তন ও যোনিদেশ বাবুই বাসার মতো ঝুলে রয়েছে। রেপ-১, রেপ-২... এভাবে আটটি ছবির নাম দেওয়া হয়। কাগজে রিভিউ হল খুবই ভাল। যদিও বিক্রি হল মাত্র একটি। কিনলেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী। বিখ্যাত শিল্পী প্রকাশ কর্মকার উদ্বোধনের দিন খুব মদ-টদ খেয়ে এসে বললেন, 'আমাদের জায়গাগুলো তুই সব ঝুলিয়ে দিলি র‍্যা চঞ্চল!' বলে ওকে সবেগে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। বোঝা গেল, ব্যাপারটা ওঁর পছন্দ হয়েছে।

গোটা ৮০-র দশক জুড়ে আমার আশপাশ থেকে যারা ফ্লারিশ করেছে, চঞ্চল তাদের একজন। পারিবারিক বাড়িটি প্রধানত তার টাকায়। ওখানে বাড়ির লোক থাকবে। সে সল্টলেকে জমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছে। নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার মানুষ আশাহীন, ক্ষয়া ও খর্বুটে এবং প্রকৃতি ভূতগ্রস্ত হলেও, সঙ্ঘ ও সরকারের জন্যে সে যেসব ম্যুরাল ইত্যাদি করেছে সেখানে সমাজবাদী বাস্তবতা। সেখানে মানুষ দৃপ্ত ও সবল, আশা ও প্রত্যয়ে ভরপুর, এবং যা সে ঘৃণা করে— অবয়বধর্মী। এখন তার সাত কি আট নম্বর ভাঁড়ার মেয়ে-কবি মনোবীণা হালদার।

মান্তু আজকাল প্রায়ই চঞ্চলের প্রসঙ্গ তোলে।

'চঞ্চলদা অনেকদিন আসেননি দাদা।'

'কেন রে, এই তো গত সপ্তাহে এসেছিল।'

'ও, হ্যাঁ' বলে সে চুপ করে যায়।

চঞ্চল এলে বলে, 'কই, আপনি রবিবার এলেন না তো।'

'আমার তো আসার কথা ছিল না।'

'আমি রান্না করে রেখেছিলাম।' বলে সে অনেকক্ষণ অস্বস্তিকর অভিব্যক্তিহীন চোখে চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মান্তু আসার পর ঘর ও বারান্দার মধ্যে অ্যালুমিনিয়ম ফ্রেমে আঙ্টা লাগানো একটা ভারি পর্দা টাঙানো হয়েছে। ফোল্ডিং ডাইনিং টেবিলটা তুলে মান্তু মেঝেয় বিছানা পেতে সেখানে শোয়।

মলুটি-দুর্ঘটনার পর মান্তুর অসুখের আর একটি উপসর্গ হল মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে কথা। রাতে যা পরিণত হয় ঘুমের ঘোরে ভুল বকায়।

তার মনোহীন ডিলিরিয়ামে একটা বিষয় ঘুরে ফিরেই আসে। পর্দার ওপাশে বিছানায় ছটফট করতে করতে মান্তু বকে চলে, 'না-না, প্লিজ, ছেড়ে দাও আমাকে... ছেড়ে দাও...'

আমি ভাবতাম, তার স্বপ্নের মধ্যে আজও ঘটে চলেছে মলুটির দুঃস্বপ্নের অনুপ্রবেশ। সব কথা অবশ্য বোঝা যেত না।

ভুল ভাঙল একদিন। দরদর করে ঘেমে ভোররাতে বিছানায় উঠে বসেছি। লোডশেডিং। দেখলাম, পর্দার ওপারে বারান্দার গ্রিল ধরে মান্তু বকবক করে চলেছে। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম সে চঞ্চলের সঙ্গে কথা বলছে।

'না! তুমি মমতাদির সঙ্গে মিশবে না। লজ্জা করে না তোমার, চঞ্চলদা! না না চঞ্চলদা, না। ছেড়ে দাও আমাকে...প্লিজ...লক্ষ্মীটি। আর নয়। ছেড়ে দাও আমাকে চঞ্চলদা। বিয়ের আগে... না, কিছুতেই না। বিয়ের জন্যে তাহলে কী বাকি থাকবে, বলো তুমি!'

'চঞ্চলদা', 'চঞ্চলদা'... মান্তু বকে চলেছে।

পর্দা সরিয়ে আমি মান্তুর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। আমি তার কাঁধে হাত রাখি।

'না আ!' তীব্রগতি সে ঘুরে দাঁড়ায়।

সে প্রথমে তার কাঁধে রাখা আমার হাতের দিকে তাকায়। তারপর মুখ তুলে আমাকে দ্যাখে। সে চিনতে পেরেছে আমাকে। কিন্তু তার দৃষ্টি দেখে বুঝি, তার মাথা আমাকে চিনতে পারছে না।

'দাদা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বল রে।'

'ঘুম ভেঙে গেল!'

'হ্যাঁ রে।'

মান্তুর মুখে চোখে একটুও অপ্রস্তুত ভাব নেই। থাকার কথাও না। এতক্ষণ কী বলছিল, সে সম্পর্কে তার কোনও সচেতনতা নেই।

বাইরে আকাশ ফিকে হচ্ছে। রায়েদের বাড়ির বেকার ছেলে ছাদে পোলট্রি করেছে। গলির ওপারে, অন্ধকার থেকে ভেসে উঠছে টালি চালের জাল-দেওয়া মস্ত ঘর। অনেক মুরগি।

আমার মনে পড়ল, মান্তু একদিন জানতে চেয়েছিল, 'আচ্ছা দাদা, কোনওদিন মোরগ ডাকে না তো।'

পোলট্রির মোরগ কি ডাকে না?

৮। রক্তমাংসময়

মমতা বলল, 'তাহলে ওই কথাই রইল। এবার তিনমাস পরে আসছি।'

১৬ মার্চ। ১৯৯০।

আবার টানা একমাস পরে মমতা এসেছে। তবে এবার যথাসময়ে। এসে, ওয়ান-টান থেকে, ওঠার আগে হঠাৎ ওই প্রস্তাবের পুনরুক্তি করল।

'ঠিক আছে। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই। সবটাই তুমি যা বুঝবে।'

'অতটা ছেড়ো না।' রাস্তায় দুই ল্যাম্পপোস্টের মাঝামাঝি অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, ওর চোখে এখনও আমার জন্যে কটাক্ষ। লঘু স্বরে বলল, 'তুমিও কিছু বলবে।'

অবুঝ সন্তানের কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেওয়া প্রায় অপত্য-মমতা ঝরে পড়ে ওর গলায় যখন ও বলে, 'এতদিন আমরা ছিলাম শুধু দু'জন। ট্রান্সফার হয়ে আসার পর সঞ্জয় রোজ যখন-তখন আসে। রোজ টেবিলের সামনে বসে থাকে। আজ অফিস না গিয়ে তোমার কাছে আসতে হল। কী করব আমি, বলো?'

রিপন স্ট্রিটের মোড়ে পুরনো জিনিস ফুটপাথে বিছিয়ে বিক্রি হচ্ছে। যেসব সংসার ভেঙে গেছে, তাদের অ্যাশট্রে, তাদের টাইমপিস, তাদের হটপ্লেট, ইস্তিরি, তাদের ক্রকারি। মায় পেডেস্টাল ফ্যান একটা। ধুলো মোছার অপেক্ষায় পিতলের রোকোকো ফ্রেমে ওভাল আয়না। পুরনো ভাঙা রেকর্ড। ইলেকট্রিকে চলা ঢাউস অলওয়েভ সেটটা, নারী ও পুরুষকণ্ঠে, পৃথিবীর সব ভাষায় এখনও কথা বলে কি?

রাস্তা পেরোবার একটা উদ্যোগ নিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল মমতা। কী একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, তিন নয়। দু'মাস। দু'মাসই যথেষ্ট। কী বলো?'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' আমি বললাম, 'অ্যান্ড ভেরি মাচ। তুমি যে এটুকু বললে, এটাই যথেষ্ট। এরপর তুমি তিনমাস পরে আসো, কি তিন বছর পরে, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। তোমার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্বলতাটুকুই আমার কাছে দামি। কিন্তু এসো যেন', আমি মনে করিয়ে দিই, 'ভুলো না, আমরা আজ পর্যন্ত কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করিনি।'

মমতার গলা শুনে বুঝলাম ও চোখ পাকিয়েছে। 'এই তুমি দু'দুবার ফেল করেছ!'

দশ বছরে মাত্র দু'বার। একবার ফুড পয়জন। আর একবার যেদিন শেষ রাতে মা মারা গেল। সেদিনও ফোনে জানাবার চেষ্টা করেছিলাম।

নইলে ঝড়-জল-বৃষ্টি, কলকাতা বনধ্, বাংলা বনধ্, ভারত বনধ্ (আংশিক), এক দাঙ্গা ছাড়া কলকাতায় কী না হয়। কিছুই, কিছুই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। গত দশ বছর ধরে আমাদের যোগাযোগ একটানা আর বিরতিহীন থেকে গেছে। ধাঁচ একটাই। নির্ধারিত দিন ও ক্ষণে নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁয় সাক্ষাৎ। ঘণ্টাখানেক কি দুই (রেস্তোরাঁর চরিত্রের ওপর নির্ভর করে) কেবিনে বসা। কিছুদূর হাঁটা। তারপর বিদায়।

এবং, ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আমাদের যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিও কত নিখুঁত। কোনও একদিন কেউ অনুপস্থিত হলে, আমরা পরপর তিনদিন সেই একই জায়গায় একই সময়ে আসতে থাকব। তিনদিন আমরা একে অপরের জন্যে ঠিক আধ ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করব। তারপর আসব পরের সোমবার, ওই জায়গায়। ওই সময়ে। তখনও যোগাযোগ না হলে পরস্পরের অফিসে ফোন করব। সেখানে না পেলে, মমতা বালিতে চঞ্চলের বাড়িতে চলে গিয়ে যোগাযোগ করবে ও জানবে। আমি ওর অপর্ণাদির সঙ্গে যোগাযোগ করব। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের অসুবিধের কথা ওদের জানিয়ে রাখব। এত সাবধানতার কারণ মমতা ওর অফিসে গসিপের কারণ হতে চায়নি শুরু থেকেই। আমার অফিসে আসতে চায় না। আমাদের ফ্ল্যাটে যে আসবে, সে উপায় নেই। ওকে দেখলে মান্তু অদ্ভুত পাগলামি শুরু করে। দ্রষ্টা প্রস্তরমূর্তির মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। পাগলের শূন্য দৃষ্টির চেয়ে ভয়াবহ ওর কাছে কিছু নেই।

পাগলামিকে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি-জ্ঞানে মান্তু থেকে মমতা থাকে শতহস্ত দূরে।

মমতার বাড়িতে ফোন আছে। কিন্তু করার উপায় নেই। বাড়িতে আমাদের ব্যাপারটা জানে।

মমতা আসতে পারেনি মাত্র একদিন। গোড়ার দিকে সেই একবার, যখন বাড়ি থেকে জোর করে ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে এবং পাত্রপক্ষ, আসবি-তো-আয় আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিনক্ষণেই ওকে দেখতে এল। মমতা জানত না কিছুই। হঠাৎ ওকে আটকে দেওয়া হয়। মমতা না-সেজেগুজে উপস্থিত হয়ও। কিন্তু এমন অশ্রুতপূর্বভাবে মিসবিহেভ করে সে, যে, বাড়ির লোক ধরে নিয়েছিল এ মেয়ের নিশ্চিত কেউ আছে এবং যথাসময়ে তা জানা যাবে। এরকম অপপ্রয়াস তারা আর করেনি।

'অশ্রুতপূর্ব' বলতে, পাত্রপক্ষের দাদা-দিদি ও মাসির প্রশ্নোত্তরপর্বের শেষে সে নির্বাক পাত্রের কাছে স্বয়ং জানতে চায়, 'কই আপনি কিছু প্রশ্ন করলেন না?' পাত্র হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে 'অন্তত এটা আমাকে জানতে দিন যে আপনি বোবা নন', সে হেসে বলেছিল। কী করে অত সাহস পেয়েছিল সে, কে জানে। আমাদের চেনাশোনার একেবারে শুরুতেই, তখনও চাকরিতে ঢোকেনি। আর আমাদের মধ্যে তো কখনও কোনও কথা হয়নি। বিয়ে-শাদির ব্যাপারে। আমাকে স্বামী হিসেবে সে ভাবতে পারছে, এমন ইঙ্গিতও কখনও পাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা বলছিলাম। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল না করার কথা। সেই যেবার চঞ্চলের এগ্‌জিবিশনের ব্যাপারে পনের দিনের জন্যে বোম্বে গেলাম। ট্রেনে টিকিট পেলাম না। চঞ্চলের কাছে টাকা ধার করে প্লেনে উড়ে এসে অসাধ্যসাধন করেছিলাম। মধ্যপ্রদেশ সরকারের কনডাক্টেড ট্যুরে বান্ধবগড়ে বাঘ দেখে পরবর্তী সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট দিনক্ষণে, ওই একবার ছাড়া, মমতাও বারবার যথাসময়ে হাজির হয়েছে।

সারা রয়েড স্ট্রিট মমতা আর একটাও কথা বলল না। কেউ কারও দিকে একবারও না তাকিয়ে চুপচাপ হেঁটে চলেছি। হঠাৎ কেমন বদলে গেল আবহাওয়াটা। একটা জোলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল।

যেতে যেতে আমার মনে পড়ল গত বছর শারদীয়ায় পড়া জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত গল্পের কথা। গল্পের নাম ছিল: রক্তমাংসময়। গোয়ালন্দর গরিব স্কুল মাস্টারের তরুণী বধূ। বাপের বাড়ি যাবে। বরকে ছেড়ে যেতে মন নেই। আচ্ছা, তুমি পারবে কি সব দিক সামলাতে। স্টোভ জ্বালাতে পারবে। দুধ জ্বাল দিতে পারবে। এইসব বলছে। আর এ-ঘর, ও-ঘর করছে। শেষ পর্যন্ত সেই ঘর ছাড়ল। রিকশয় উঠল। স্টিমার ছাড়ল গম্ভীর ভোঁ দিয়ে। শীতের ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢুকে গেল অচিরেই।...

'সাতদিন পরে খবর এল সুষমা কলেরায় মারা গেছে।'

জীবনের সমস্ত সুসময় তো একটা না একটা ছলনা। এরা ভুলিয়ে ভালিয়ে হাত ধরে নিয়ে যাবে সর্বনাশেরই দিকে। পৃথিবীর সব সুবাতাস একদিন দেখা দেবে ঝড় হয়ে। এভাবেই শেষ হয় গল্পটি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এলিয়ট রোডের মুখে এসে পৌঁছলাম। অস্পষ্টভাবে মেঘ ডাকল কি আকাশে? দেখবার জন্য মুখ তুলতেই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল এসে আমার কপালে।

'আসলে কী জানো মোমো', বৃষ্টির ফোঁটা কপালে পড়তেই আমার তখুনি যা মনে হল ভাষায় তার অব্যর্থ আত্মপ্রকাশ দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই, 'তুমি ব্যাপারটাকে ভাবছ অঙ্ক দিয়ে। আর আমার ভাবনা জ্যামিতির।'

৯। প্রেম ও প্রয়োজন

মমতা বলল, 'চলো, একটু হাঁটি।'

এলিয়ট রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সার্কুলার রোডে এসে গেলাম। ইদানীং পাশাপাশি হাঁটি না অনেকদিন হল। মাঝে মিনিটতিনেকের বৃষ্টি হয়ে গেল ঝরঝরিয়ে। দেখলাম কোনও ছাউনির নিচে দাঁড়াবার মতি তার নেই। গতিও বাড়াল না। না বলে-কয়ে যেভাবে এসেছিল, বৃষ্টি সেভাবেই ঝপ্ করে থেমে গেল। আকাশের রঙ কালো। মেঘ থাকলে লালচে দেখাত।

অনেকদিন পরে পথের দিকে তাকিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। বেশ ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে, মমতার অবচেতন মন, সেই গোড়া থেকেই, এই রিপন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েড-ফ্রি স্কুল-এলিয়ট রোড এলাকাটি বেছে নিয়ে, তার পক্ষে ভাল বই মন্দ করেনি। আমাদের মিডিল ক্লাস লোকজন এ পথগুলো বড় মাড়ায় না।

তবু ইদানীং, আমাদের হাঁটাচলার ব্যাপারেও মমতা একটি নিখুঁত ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আমি আর মমতা হাঁটি ঈষৎ সামনে-পেছনে। ধরা যাক, ওয়ান-টান থেকে ধর্মতলা বাসস্টপ পর্যন্ত আমরা হাঁটছি। মিউজিয়াম ও জিওলজিক্যাল সার্ভের সদর স্ট্রিট গেট দিয়ে ঢুকে পড়ে তবে আমরা পাশাপাশি হব। এবং মাঝখানের পুকুর ও নির্জন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় (রাত আটটা নাগাদ) আমি হাত জড়িয়ে ধরব মমতার। সদর স্ট্রিট গেট পর্যন্ত এভাবে যাব। হাত জড়িয়ে ধরতে গেলে, পৃথিবীর সব প্রেমিকের হাতই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তার আগে একটু প্রেমিকার পাছায় লেগে যায়। সে কথা স্বতন্ত্র। জড়াজড়ি করে যাবার সময় প্রেমিকা স্তন চেপে ধরে থাকে প্রেমিকের কনুই-এর ভাঁজে। অবশ্য সবটাই নির্ভর করবে নির্জনতার কম-বেশির ওপর। সদর স্ট্রিট গেট দিয়ে ঢুকেই যদি দেখা গেল দু'ধারে তরুবীথিকার মধ্য দিয়ে রাস্তাটি সম্পূর্ণ জনশূন্য, তখন তো আর পাশাপাশি হাঁটার কোনও মানে নেই। খুব শীতের রাতে মিউজিয়াম ও জিওলজিক্যালের যৌথ চত্বরে কলকাতার দীর্ঘতম ইউক্যালিপটাস গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমি মমতাকে বহুবার দীর্ঘ চুম্বন করেছি। ঘন কুয়াশা থাকলে আমাদের চুমোচুমি চলেছে বহুক্ষণ। একদিনও বাদ যায়নি।

কিড স্ট্রিটে পড়েই আবার ছাড়াছাড়ি।

এইসব রাস্তার জগৎ মধ্যবিত্ত-মদির না হলেও ক্বচিৎ কারও সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়নি কখনও, এমন না। হলে, অসুবিধে কিছু নেই। আমার লোকের সঙ্গে দেখা হলে, মমতা তো এগিয়েই আছে। একদিন মোকাম্বোর কাছাকাছি মমতার অফিসের বিল সেকশনের সুপারিনটেনডেন্ট! একে বস তায় মাতাল, বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখল মমতাকে। এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে, আমরা সেখান থেকে পঞ্চম ল্যাম্পপোস্টের নিচে অপেক্ষা করি। যেদিন যার পালা।

তারপর কোনও দিন মিন্টো পার্ক হয়ে কোনও দিন মল্লিক বাজার কি পার্ক স্ট্রিট সার্কুলার রোড মোড় পেরিয়ে ওকে বেকবাগান পর্যন্ত পৌঁছে দিই। ছাড়াছাড়ির জায়গাও আমরা প্রায়ই বদল করি। উদ্দেশ্য, একই জায়গার দোকানদারদের কাছে লক্ষণীয় হয়ে না ওঠা।

কড়েয়া রোড অব্দি মমতাকে এগিয়ে দেওয়া আর হয় না। মমতার ওপর তার পাড়াতুতো হকদারদের সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে সচেতন। গোড়ার দিকে, প্রবল বৃষ্টির কারণে, একবার একই ছাতার নিচে ওকে প্রায় বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে বাধ্য হই ও অন্ধকার রক থেকে 'পাড়ার জিনিস পাড়ার বাইরে যাবে না' এই কঠিন দৈববাণী শুনি। সেই থেকে বর্ষাকালে আমরা দু'জনে দুটি ছাতা আনি। মোটকথা প্রকাশ্য রাজপথ ধরে আমাদের এরকম হাঁটা-চলা কালক্রমে এক নিখুঁত কোরিওগ্রাফে পরিণত হয়েছে।

গত একমাসে বিস্তর গুরুতর ব্যাপার দ্রুত ঘটে গেছে।

মমতা আজ ওয়ান-টানের কেবিনে বসে অনেক কথাই বলেছে যা ভীষণ সত্যি কথা। সব আমি জলের মতো বুঝতে পেরেছি। যথা:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১। সঞ্জয় কিছুদিন ধরেই বলছিল, বাড়িতে পাত্রীর ছবি দেখাচ্ছে, সে বারণ করবে কি না। অনুমেয় হাসি হেসে মমতা তাকে যথারীতি স্মার্ট উত্তর দিয়েছে। যে, তাকে দেখাচ্ছে। সে উত্তর দেবে। যা বলার সে বলবে। মমতা তার কী জানে। বলে সে, এখানে, স্বভাব-সিদ্ধভাবে, তার স্মিত মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে আশা করা যেতে পারে।

২। গত মাসের মাঝামাঝি সঞ্জয়ের ফ্লু হলে, সে ওর বাড়িতে, সল্টলেকে, দেখা করতে গিয়েছিল। পিতৃহীন সঞ্জয়, মা, পিসিমা, দাদা-বৌদি— সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। সঞ্জয়ের দাদা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। মমতা আসবে বলে বৌদি তাঁকে থাকতে বলেছিল। বিচারকের মর্মভেদী চোখে পরিবেশিত চা-এর কাপে আর কেউ ঠোঁট ছোঁয়াবার আগেই মমতা চুমুক দিয়েছিল— এ ছাড়া কোনও অপরাধ তাঁর চোখে পড়েনি বলে সঞ্জয় জানিয়েছে। অবশ্য তাঁর মতে, এটা ক্ষমার অযোগ্য নয়। মমতা অত্যন্ত অপছন্দ করেছে সঞ্জয়ের দাদাকে। যদিও সঞ্জয়কে তা জানায়নি।

৩। সঞ্জয়-ব্যাপারে ওর মন এখন অবাধ্যতা করে না। মনের সায় ও ক্রমেই বেশি করে পাচ্ছে। এটা প্রথম লক্ষ্য করে সঞ্জয়ের অসুখের সময়, যদিও ফ্লু-মাত্র। সে সর্বান্তমনে সঞ্জয়ের আরোগ্য কামনা করছে, সে দ্যাখে। সঞ্জয়ের জন্যে তার আজকাল মন খারাপ হয়। হলে ফোন করে, সে সঞ্জয়ের বাড়িতে চলে যায়। সঞ্জয় অফিস যায় না। সারাদুপুর থাকে তার ঘরে। না-না, দরজা খোলা থাকে। বাড়িতে কী ভাববে। ছি।

৪। আর হ্যাঁ, তা-ছাড়া বিয়ে তো তাকে করতেই হবে কারুকে। হয়ত মনে হবে, না করলেই হত ভাল। তবু তো একা থাকতে হবে না। ভালবাসা না থাক, ঝগড়া তো হবে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে জানা তো যাবে, সারারাত একলা ঘুমোয়নি। বাবার অবশ্য শরীর স্বাস্থ্য এমনিতেই ভালই। তবে চুয়ান্ন তো পেরল। তারপর দাদা-বৌদির সংসারে ধাড়ি আইবুড়ো বিবাহিত ননদ কেন। কী জন্যে? ইত্যাদি।

এসব মমতার ব্যাপার। তার অঙ্কের ব্যাপার। উত্তর মেলানোর ব্যাপার।

আমি একটা কথাও বললাম না। কিন্তু শেষকালে মমতা যা বলল, শুনে আমি আর চুপ করে থাকতে পারিনি।

'দ্যাখো, আমার আগে একটা অ্যাফেয়ার ছিল সেটা দোষের নয়। কিন্তু একসঙ্গে দুটো অ্যাফেয়ার চালানো নিশ্চয়ই ইম্‌মরাল।' মমতা সবশেষে বলল, 'অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ডাই আ মরাল উওম্যান।'

'শোনো', চেয়ার ছেড়ে ওঠার ভঙ্গিমার সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই প্রথম আমি কথা বললাম, 'এরপর তাহলে আমি আর আসছি না।'

'ক্যানোও!'

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মমতা। তার মুখ বিবর্ণ। চোখ বিস্ফারিত।

'কারণ', তার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি বললাম, 'আত্মসম্মান আছে এমন কারো এ কথার পর আসা উচিত নয়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না না। আসবে! আসবে!'

আর্ত ক্ষীণ স্বরে টেবিলে মাথা রেখে সে বলতে লাগল। হাত বাড়িয়ে আমার হাত খুঁজতে লাগল। এবং পেল না।

মমতা যখন এরকম করে ফেলে, জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার পাবার আনন্দ ঘনিয়ে আসে আমাকে ঘিরে। মনে হয়, এ কোনও আলাদা জিনিস নয়। এই কান্নাভাঙা বিমূর্ততা, এ আমারই একখণ্ড; যদিও আমার হাত-পা-মুখ-চোখ কি নখ-চুল-দাঁতের মতো— আমার লিভার-কিডনি-হার্টের মতো— সে অংশ-আমির যে কী নাম তা বলা সম্ভব নয়। শরীরের ঠিক কোথা থেকে এক নিমেষে এসে কোথায় নিয়ে যায়, বোঝা সম্ভব নয়।

আমার অস্তিত্ব থেকে ওর আর্তনাদের অনুরণন তখনও মুছে যায়নি। কিন্তু এর মধ্যেই মমতা সামলে নিয়েছে নিজেকে।

'ক্ষীণ হলেও একটা যোগসূত্র আমাদের থাকবে।' মমতা বলল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং শান্ত তার গলা, নইলে তো আমার জীবনের দশ-দশটা বছর মিথ্যে হয়ে যাবে।'

কিন্তু, এই কি মরাল উওম্যানের কথা! ইচ্ছে হয় বলি, তা হয় তো হোক। ইউ গো টু হেল। কী বলতে চায় মমতা? বিয়ের পরেও ও যোগাযোগ রাখবে? এবং আমাকে আমার রাজস্ব দিয়ে যাবে? বঞ্চিত করবে না!

তাহলে তো আগাগোড়া আমি যেভাবে দেখছি সেটাই ঠিক। আমার হারাবার কিছু নেই। মাঝে মাঝে একে ধর্ষণ করে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া করার কিছু নেই।

প্রয়োজনের জন্যে সঞ্জয়। আর যুক্তিতর্কাতীত আবেগের জন্য আমি।

উত্তর মিলে গেছে। ফুল মার্কস। বাঃ, ব্রেভো।

১০। দেহ ও দেহাতীত

মানুষ মানুষের কাছে প্রথমত কী উপস্থিত করে? নিঃসন্দেহে তার শরীর। তারপর নামধাম। যে, আমার নিজের নাম অন্যে রাখলেও, বাপ-মা পড়ে-পাওয়া হলেও, এই শরীরটা কিন্তু আমার নিজের। এর অসুখ করলে কার অসুখ করবে— আমার! 'আমাদের অসুখ' নামে কোনও অসুখ আছে কী? আমার আর কিছু মানো আর না মানো, তাই আমার শরীরটাকে স্বীকৃতি দাও। যে, অন্তত এটা আমার (অভ্যাগতর উদ্দেশে উর্দুভাষীরা হাত দুলিয়ে আভূমি বিনতিপূর্বক কী সুন্দর করে বলে, 'আইয়ে আইয়ে তসরিফ রাখিয়ে!' অর্থাৎ কিনা, আসুন, আসুন, আপনার শরীরটা রাখুন।)

শুধু মেয়েদের শরীর-অধিকার কোনও দিনই তার নিজের নয়, মেয়ে, পাগল এবং ক্রীতদাসের।

প্রাক-ইতিহাসের পর, ইতিহাসের শুরু থেকে কোনও পর্বেই গোষ্ঠী বা সমাজ, তাদের এ অধিকার দেয়নি, মেয়েদের। গণতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, স্বৈরতন্ত্রী, পুঁজি অথবা সমাজবাদী— কেউ না। এই একটি ব্যাপারে সব শিয়ালের এক রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার ঋতুস্রাব হয়, তুমি গর্ভধারণ কর, প্রজন্ম রক্ষার দায়ে প্রকৃতির ইচ্ছার সঙ্গে তুমি নাড়ির টানে বাঁধা। তুমি কম-মানুষ। তুমি মেয়েমানুষ। ক্রীতদাসী। জায়া, জননী, সতী প্রভৃতি বিবিধ রক্ষাকবচ ধারণ করে তোমার কাজ একটাই। নিজের বারবধূত্ব ঘোচানো। ওগো মেয়ে তুমি কার? না, যে আমার মালিক, তার।

মমতা চাইছে শরীরের মালিকানা একজনের হাতে তুলে দিয়ে, তার কামনা-বাসনাকে বৈধ ও সমাজসিদ্ধ করতে। কে তাকে বোঝাবে, মানুষের কামনা-বাসনা, তার আবেগ এবং মানুষের প্রয়োজন এক জিনিস না? আবেগ আগে জন্মায়, সামাজিক প্রয়োজন তাকে যুক্তিতর্কায়িত করে পরে। জীবনের মহীরুহ হব পরিণত করে বনসাই-এ। টবে লাগায়। কে তাকে বোঝাবে।

মমতা যা করতে চলেছে, আমি বুঝি। তার দশ বছর ধরে প্রেম করা হয়েছে। সে এবার বিয়ে করবে। জীবনের একটি অধ্যায় শেষ। সে এবার একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করবে। কে তাকে বোঝাবে, ওগো খুকি, এমন কি উপন্যাসেও, পরবর্তী অধ্যায়ে আগের অধ্যায়ের ছায়া থাকে। আগের অধ্যায়গুলি, অলিখিত পরবর্তী অধ্যায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শরীর! শরীর! শরীর একটি কাঠামোময় বাস্তব অথচ অলৌকিক জিনিস। এর চেয়ে কাছের এবং দূরের জিনিস, এর মতো একক ও বহুমাত্রিক— মূর্ত বিমূর্ততা— জীবনে আর কিছু নয়। তবু এ শরীর, এর সেই অদেখা অধোমুখ পায়ুদ্বার অবধি— এ আমার একান্ত নিজের। কেউ এর হকদার হতে পারে না। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কেউ এর মালিক হতে পারে না।

সেই শরীরকে মমতা রেজিস্ট্রি করে যাচ্ছে বাঁধা দিয়ে বৈধ করতে। এই প্রশস্তজঘন যা একদিন ঢাকা থাকত কৃষ্ণকুন্তলে, এই মধ্যদেশ যা বেদির মতো, পাকা পোনার পেটির মতো যোনি, কুচযুগল যা দিনে দিনে বড় হয়েছে আমার তালুর মাপে— এর মালিকানা সে নিজ হাতে তুলে দিতে চলেছে একজন স্বামীর হাতে। এই শরীরটা হবে তার বৌ। কেন? না, সে একে বিয়ে করবে। এই শরীর, এ আমার কেউ নয়। কেন, না একে আমি বিয়ে করিনি। ঘরে তুলিনি। নারী, তুমি কার? না, যে আমাকে (বিয়ে করে) ঘরে তুলবে তার!!

ক'দিন আগে আমি এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে শিউরে উঠেছি। দশ বছর ধরে দেওয়া আমার অনেক উপহার মমতার কাছে আছে। ১৯৮০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আমাদের প্রথম পরিচয়-বার্ষিকীতে আমার জুয়েলার-বন্ধুর দোকান থেকে কিনে দিই দুটি সোনার দুল। স্বপ্নের শত শত আর্শিতে সেই দুল পরে দাঁড়িয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে চুল তুলে দেখছে। পরের দৃশ্যে কান থেকে সোনা খুলে নিচু হয়ে সে রাস্তার নর্দমায় ফেলে দিল।

১১। বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?

মমতা বলল, 'চলো, একটু হাঁটি।'

আমাদের পিছনে অন্ধকার পার্ক সার্কাস কবরখানা। মমতার ট্রামের জন্যে আমরা দাঁড়িয়ে। মল্লিকবাজারের সামনে ফুটপাথে, এমন কি, রাস্তার ওপরে গজিয়ে-ওঠা নতুন নতুন দোকান। খাবার-দাবার, স্তূপাকার সিমুই, বাচ্চাদের রঙচঙে জরিদার জুতো, লাল-নীল টুপি। ইদ এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। মমতা বলে মুসলমান পাড়ায় থাকি। ইদই আমাদের দুর্গাপুজো।

সে ফির্নি খেতে ভালবাসে।

মমতা বলল, 'তাহলে তিনমাস পরে হলে তোমার সত্যিই কোনও আপত্তি নেই?'

'বললাম তো।' আমি বললাম, 'মাস কেন। বছর হলেও আপত্তি নেই। আসল কথা হল, তুমি আর-একটা অ্যাপো করবে। এলে, শুধু সেদিনই ঠিক হবে আর একবার দেখা হবে কিনা।'

মমতা হেসে বলল, 'যেমনটা হয়ে আসছে?'

'যেমনটা হয়ে আসছে।'

'ঠিক আছে এসো তাহলে, সিক্সটিনথ্ মে।'

'নাইটিন নায়েন্টি?' আমিও হাসতে হাসতে বললাম, 'এর মধ্যে মরে-টরে গেলেও কিন্তু আসছি।'

শ্যাম্পু বিজ্ঞাপনের মেয়ের মতো তার ঘাড় পর্যন্ত চুল ওদিক থেকে এদিকে দুলিয়ে মমতা বলল, 'না না প্লিজ, তাহলে এসো না।' হাত নাড়িয়ে। 'তাহলে আসার একদম দরকার নেই।'

সিগারেট দোকানের দড়ি থেকে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে আনি। পৌনে ন'টা হবে। মমতা এবার যাবেই। আমি যাব বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। অটোমোবিল ক্লাবে। ওখানে চঞ্চল বসে আছে। সেই সাড়ে আটটা থেকে। বঙ্কু ওকে প্রথম ড্রিঙ্ক সার্ভ করে গেছে। এখন থেকে মাঝে মাঝে ও দরজার দিকে তাকাবে। আমার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার ছবি ও এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছে। আমারও যাওয়া দরকার। চঞ্চল আজ আমাদের ফ্ল্যাটে থাকবে। মান্তু রান্না করে রেখেছে।

গভীর, অতলস্পর্শী বিষণ্ণ গলায় মমতা আবার বলল, 'আমি আসব। যোগাযোগ রাখব। যদি বিয়ে করি, হয়ত তার পরেও। কিন্তু কেন আসব, আমাকে বলতে পার?'

'কেন, এ প্রশ্ন কোরো না। উত্তর পাবে না। তাহলে আসতে পারবে না।'

'অবিনাশ, তুমি কি কারুকে, কোনও কিছুকে ভালবাস?'

'বাসি।'

'কী ভালবাস তুমি অবিনাশ। বা, কাকে?'

'আমি ভালবাসি আমার আত্মসম্মান।'

'এক কথায় ইগো। কিন্তু তুমি যাকে ভাবছ আত্মসম্মান সেটা কি তোমার ভীরুতা হতে পারে না?' কারণ, তা যদি না হত, মমতা বলল, 'তুমি তো আমাকে ধরে রাখতে। সরে যেতে দিতে না।'

একটা কিছু কেঁপে উঠল কি? বুঝলাম, আমার শিকড়। কিন্তু, সে তো ওপর থেকে টের পাবার উপায় নেই। সে আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবে না জেনেও আমি সতর্ক হয়ে পড়ি। মমতার দিক থেকে দশ বছরে এই প্রথম একটা আক্রমণ। আমি মুখ ঘুরিয়ে রাখি।

মমতা আরও একটা ট্রাম ছেড়ে দিল। উত্তর শোনার জন্যে ও কি সেই গোয়ালন্দর বধূর মতো পা ঘষছে?

দূরে আর একটা ট্রাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবভাবে বুঝি বালিগঞ্জগামী হলেও এটা ধরবে।

'ক্লাবে যাবে। সঙ্গে টাকা আছে?'

'চঞ্চল আসবে।'

'তোমার টাকা আছে?'

'আছে।'

'কত?'

'পঞ্চাশ-ষাট হবে।'

'সে তো তাহলে ষাট টাকা অব্দি মদ খাবে। তারপর?'

আমি চুপ।

'শোনো।' একটা কুড়ি টাকার নোট গুঁজে দিয়ে আমার হাতে মৃদু চাপ দিল সে, 'ট্যাক্সি করে ফিরবে। আমার এই টাকা দিয়ে মদ খাবে না।'

মমতাকে নিয়ে ট্রাম ছেড়ে দিল।

ফাঁকা ট্রাম। সে এদিকেই লেডিজ সিটে বসল। আজ, এই প্রথম ফিরে তাকাল না। কিন্তু, চলে যেতে যেতে সে কি একটিবার ফিরে তাকাবে না, যে আবার আসবে?

ট্রাম পরের স্টপে দাঁড়িয়ে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওর বাড়ির স্টপে পৌঁছে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকব? আমার কি আর কিছু করা বা বলা বাকি থেকে গেল। যা এক্ষুনি না বললে ভবিষ্যতে আর সে সুযোগ আসবে না। না করলে, আমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে?

আজ সারা সময় মমতাকে একবারও ছুঁইনি। ভুলে গেছি। যাবার আগে সে-ই ছুঁয়ে গেল।

তিনমাস পরে, ১৬ জুন, মমতা ওয়ান-টানে এল না। তারপর তারই নিজের হাতে সাজিয়ে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিনগুলির একটিতে এল না। মালতীদি জানালেন, মমতা তাঁকে বলে দিয়েছে যে সে আর আসবে না। আমি যেন ক্ষমা করি তাকে।

দশ-দশটা বছর ধরে মমতা পথে পথে ঘুরেছে আমার সঙ্গে। সে কী আশা করতে পারে না যে, তার পুরুষসঙ্গীও একটু রিস্ক নেবে? ন্যূনতম রিস্ক না নিয়ে যে পুরুষ সদাসতর্ক থাকে তার কানাকড়ি সামলাতে, সে কি, যে-কোনও মেয়ের চোখে শেষ পর্যন্ত হাস্যকর হয়ে যায় না?

মালতীদি ফোনে আমার কাছে জানতে চাইলেন।

১২। ঝরানো পাতার পথে...

এটা একটা খুন, যা মমতা করল।

আর, যদি তাই হয়, তাহলে বলতেই হবে যে, এভাবে খুন হওয়ার ব্যাপারটা আমার মতো একজন নিহতের পক্ষে তেমন কিছু নয়। অন্তত যেমনটা নাকি এর প্রসিদ্ধি।

আগেও বলেছি, আমার জীবনে যদি কিছু ঘটে যায়, যখন যা ঘটে, আমি তখুনি তা মেনে নিই। আর এভাবে মেনে নিলে যা হয়, ঘটনা আর ঘটনা থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা মারা গেলেন। দেখলাম, এখন এটা একটা শব। এর মধ্যে আমার মা আর নেই। 'ওগো মা' বলে কান্নাকাটি তাই করলাম না। মেনে নিলাম। মান্তু পাগল হয়ে গেল। বুঝলাম, এ মান্তু নয়। পাগলি একজন। মেনে নিলাম। যুক্তি বিচারের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এ আমার স্বভাব। প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে আমার জীবনে তাই, অপ্রত্যাশিত ঘটে না কিছুই।

মমতার ব্যাপারেও এর অন্যথা হল না। আমি মেনে নিলাম যে সে আর আসবে না। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, আমি দেখলাম, মাইনাস-মমতা আমি যা, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্তত, আমার কাছে।

মানুষ তো অন্ধও হয়ে যায়। তবু সে কি বেঁচে থাকে না? আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অন্ধ ও বোবা— এক করুণাপ্রত্যাশী ভিক্ষুক ছাড়া— এরা দিব্যি বেঁচে থাকে। চক্ষুষ্মান ও বাক্যবাগীশদের চেয়ে অন্তত তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। ঢের হাসিখুশি। খোঁড়া মানুষ অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হাঁটে।

মমতা ছাড়াও আমার ঘরে রয়েছে মান্তু। ঘরে, আমি এখনও দোসরহীন একা নয়। বাইরে রয়েছে চঞ্চল। আর যা ঘরেও নয় এবং পরেও নহে, আমার মনোহীনতাকে লালন করার জন্যে আমার সেই অফিস রয়েছে। আমি ভাগ্যবান যে অফিসে আমার কাজ অঙ্ক দিয়ে। সেখানে জ্যামিতি লাগে না। তাছাড়া, এমন তো নয় যে, মমতা-বিচ্ছেদের দরুন আমার নারীর ওপর সমস্ত দাবি খারিজ হয়ে যাচ্ছে? আরও একটা-দুটো অ্যাফেয়ার হতে কি পারে না? সাউথ ব্লকের মিসেস গাউর কি অফিসের ডিভোর্সি স্টেনো শেফালি বসু, এরা কেউ মমতার বিকল্প হতে পারবে না ঠিকই। তবু জীবন চলবে, এবং মমতা ছাড়াই। মানুষ বাঁচতে চায়। কিন্তু জীবনে তার এই চাওয়ার গুরুত্ব কতটুকু? একটা পরিসংখ্যান নেওয়া সম্ভব হলে দেখা যেত, বেঁচে-থাকাই বাঁচিয়ে রাখে জীবনের নিরানব্বই ভাগকে। জীবনের চাওয়া-ফাওয়া নয়।

অপর্ণাদির মাধ্যমে মমতা আমাকে যা জানিয়েছে, তাতে তাই আমার তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তার বিবৃতি থেকে শুধু একটা অংশই আমি গ্রহণ করেছি। যেখানে মমতা বলেছে, 'যদি পথে-ঘাটে দেখা হয়ে যায় তো আলাদা কথা।'

মমতা তাহলে আবার দেখা হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি। এখানে মমতা নিঃসন্দেহে তার দুর্বলতার একটা ক্লু রেখে গেছে। আর এগুলোই তো হাতের তালুর মতো সেই ছোট্ট মেঘ, যার কোনও কোনওটি বহুক্ষেত্রে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে, সারা আকাশ ঢেকে ফেলে! তাই না? তা, দুর্বলতা যদি কিছু প্রকাশ করে, মমতা করুক। আমি নয়।

চঞ্চল বলে, 'ও নিজেই আসবে তোর কাছে। আজ না হয় কাল।'

চঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে আশা আর বিশ্বাসের ওপর। জীবনে আশা ও বিশ্বাস হারানো নাকি পাপ ('তোর মুণ্ডু'— আমি।), তাই সে আশান্বিত ও বিশ্বাসবাদী হয়েছে। তার সম্পর্কে অন্তত, আমি যা জানি, তা হল, প্রকৃত প্রস্তাবে সে এক লেংড়ু। বেঁচে থাকতে তাই ওরকম দুটো ক্রাচ তার দরকার হয়েছে। আমি চলি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি করিডর দিয়ে।

মমতা যদি আসে আসুক। না এলে, আসবে না। কিন্তু এ দুটি সম্ভাবনার কোনওটিকেই বাস্তবায়িত করার জন্য কোনও প্রয়াস আমি করতে পারব না। আমি ওর অফিসে ফোন করতে পারব না। ওর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে, দূর থেকে, সঞ্জয় আর মমতাকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে আমি পারব না। অপর্ণাদি যদি ভাবে সে সাহস আমার নেই, ভাবুক। কিন্তু নিজের প্রবণতাকে উত্ত্যক্ত আমি কখনও করিনি। এখনও পারব না করতে। আমি এইরকম। আমার চরিত্র এইরকম। এই আমার স্বভাব। আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক, আমি সারাজীবন তাই করে গেছি। এবং নিজেকে এ জন্যে আমি দোষ দিই না। দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।

এ বরং ভালই হল। যে, মমতা আমার স্বভাবের এই আজন্ম চালিকা-শক্তিকে নতুন করে চিনিয়ে দিয়ে গেল। পথভ্রান্তির সুযোগ আর রইল না। শ্বাসপ্রশ্বাসময় ও ক্ষুধাতৃষ্ণাসম্বল আবার সেই অনুমেয় করিডরই আমার জীবনের রাজপথ— যদিও, সে পথের শেষে কিছু নেই। যদিও, সে পথ কোথাও পৌঁছয় না। তা হোক।

পথে-ঘাটে যদি দেখা হয়ে যায়, যা মমতা বলেছে, সে কথা আলাদা। হ্যাঁ, পথঘাট দিয়ে আমি হাঁটি বৈকি। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মমতাকে খোঁজার কথা আমার মনে থাকে না। ভিড়ে আমি তো মানুষের মুখ দেখে চলি না কোনও দিন। মানুষীর মুখ দেখে কোনও দিন চলতে চলতে আমি দেখি, আমার জুতো অথবা চটি। যেদিন যা। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আচ্ছা, মমতা (এবং সঞ্জয়) তো ওইখানটায় থাকতে পারে। গ্র্যান্ড হোটেল আর্কেডে ঢোকার আগে একদিন, তখন সন্ধেবেলা, এরকমই মনে হল। আমি, এমন কি, রুমাল বের করে মুখটুকও মুছে নিচ্ছি দেখি। মাঝে মাঝে এরকম খুঁজি। কিন্তু ওই আর্কেডটুকু। লিন্ডসে স্ট্রিটের শুধু মুখটুকু। নিউ এম্পায়ারের সামনের জটলাটুকু। তার বেশি পারার আগে আমার স্বভাব আমাকে তার স্বাধিকারে টেনে নেয়।

কিন্তু, যদি দেখা হয়ে যায়, কোনও দিন সত্যিই, এবং মুখোমুখি, তখন এটা তো একটা ঘটনা, আর তা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতেও হবে। তখন কী বলব আমি তা ঠিক করে রেখেছি। 'আমি যেন তাকে ক্ষমা করি'— এ কথার মধ্যে দিয়ে মমতা তো একটা আবেদনই রেখেছে আমার কাছে? যে, গত দশ বছর ধরে কলকাতার মাটির নিচে যে সমাধিঘর আমরা তৈরি করেছি, তার প্রবেশ পথের হদিস যেন কেউ না জানতে পারে। যে গোপনতা শুধু আমাদের দুজনের, আমি যেন তার অসম্মান না করি।

ভয় নেই মমতার! ইচ্ছে থাকলেও আমি তা পারব না করতে। আমি তা করতে পারি না যা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক। সে আমার সাধ্যের বাইরে।

'আর-এ! লঙ্ টাইম নো সি।' আমি বলব (হেসে), 'কী খবর তোমার?'

সঞ্জয়কে না দেখে।

মমতা স্বস্তিবোধ করবে। অবশ্য, তার আগেই যথারীতি একগাল হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করেছে। আর মিথ্যেও তো নয়। সত্যিই, অনেক, অনেকদিন পরে দেখা হচ্ছে (ধরা যাক একবছর)!

'এই যে, সঞ্জয়। আমার বন্ধু।'

আমি তখন সঞ্জয়কে দেখব। সেই প্রথম। ততদিনে বিয়ে হয়ে, হ্যাঁ, যেতেই পারে ওদের। সেক্ষেত্রে 'হাজব্যান্ড' বা 'স্বামী' যা মুখে আসবে তাই মমতা বলবে? মনে হয়, না।

বক্তব্য যা রাখার, তখন রাখবে তার শরীর। এরকম ঝকঝকে সাদা বালুচরীতে আগে কখনও দেখেছ কি? লাল বেনারসী ব্লাউজ, পরেছি কখনও আগে? চুলে কার্ল, মুখে ফেসিয়াল, এ সব ছিল কি? সিঁদুর দেখা যাবার কথা নয়; কিন্তু কপালে সিঁদুরের টিপ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি, শ্রীমতী তপাদারকে দেখে তখন কে বিশ্বাস করবে, এই সেই মমতা সেনগুপ্ত! ওয়ান-টান, নিউ এম্পায়ার, জোব চার্নকের কবর কি ডায়মন্ডহারবারের— আমার সর্বত্রগামী দশ হাজার চুম্বনের একটির চিহ্নও কি কোথাও থাকতে নেই? সত্যি, পারে মমতা। অবশ্য আমিই বা কী কম পারছি!

'কনগ্র্যাচুলেসনস্!' আমি সঞ্জয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিই। কিন্তু যেভাবে হাত খুলে নেয় সঞ্জয়, আমার মনে হয়, মমতা, যৎসামান্য হলেও, কিছুটা ওকে বলে রেখেছে। আর, ওর মতো পারদর্শিনীর পক্ষে সেটাই তো স্বাভাবিক। দশ-দশটি বছর ধরে আমাদের জুটিকে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতে ও সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে শত শত লোক। শুধু কলকাতার অলিগলি ও রাজপথে আমরা যত পথ হেঁটেছি— সোজা হাঁটলে তাজমহল পর্যন্ত তো হবেই। কলকাতার হাজার-হাজার লোক আমাদের দেখেছে। তাদের মধ্যে থেকে একজনও কি সঞ্জয়ের চেনা বেরিয়ে যেতে পারে না? সঞ্জয়ের অফিসের বিজয়ন নাইয়ার সঞ্জয়ের আগে থেকে মমতার পূর্বপরিচিত। গ্লোবে আমাদের পেছনের সিটে একদিন সস্ত্রীক বসে। ইন্টারভালে মমতাকে কথা বলতে হয়েছিল। ছবিটির নাম ছিল 'জার্নি টু দা এন্ড অফ দা নাইট'। অধিকাংশ দৃশ্য ছিল নৈশ। বিয়েতে সঞ্জয় কি তাকে নিমন্ত্রণ করতে/করে থাকতে পারে না? মমতার অফিসের টেলিফোন অপারেটর কৃষ্ণা হালদারের সঙ্গে সঞ্জয়ের সামান্য আলাপ হয়েছে জেনে, মমতা অফিসে আর ফোন করতে বারণ করেছিল আমাকে।

পথে দেখা হয়ে গেলে, সঞ্জয়ের প্রতিক্রিয়া দেখে আমার মনে হবে, যৎকিঞ্চিৎ হলেও কনফেসনের পরে সে সহধর্মিণীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঠাউরেছে। এবং ক্ষমাও করে দিয়েছে। যত দোষ আমার, এই নন্দ ঘোষের। আমি বুড়োধাড়ি লম্পট, সিডিউস করেছি এক নিষ্পাপ কুমারী মেরিকে। আমি বাস্টার্ড। আমার করমর্দন থেকে, ডুয়েলের আগে খাপ থেকে তলোয়ারের মতো, সঞ্জয় যেরকম শান্তভাবে হাত খুলে নেবে— আমার সেরকমই মনে হবে। যদি প্রতিশোধ নিতে চায় এবং তখুনি, পারব কি রুখতে?

'আচ্ছা চলি, কেমন?' কথা না বাড়িয়ে মমতা এগিয়ে যাচ্ছে। এরকম দেখা হয়ে গেলে, যদি আগে থেকে কিছুই না বলে রেখে থাকে, আমার সম্পর্কে এখন কী বলবে সঞ্জয়কে— সে তো মমতা অনেক আগেই ভেবে রেখেছে।

শুধু একদিন একটা ভূতগ্রস্ত ব্যাপার ঘটে গেল।

ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। সঙ্গে রাস্তার ওপর দু'চারটে খট-খটাস্ শব্দ। তারপরেই সারবন্দী গাড়ির ওপর প্রবল ঝনাৎকারে অঝোরে শিল পড়তে লাগল। রাস্তায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। স্বর্গীয় গাট্টার হাত থেকে মাথা বাঁচাতে যে যেখানে পারে ঢুকে পড়ছে। গোটা লিন্ডসে স্ট্রিট মুহূর্তে ফাঁকা।

গ্লোবের লবিতে ঢুকে পড়ে আমি স্টিলগুলো দেখতে লাগলাম। 'ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মিস্ট' আসছে। আমার সঙ্গে ক'মাস আগেই ফিল্ম ফেস্টিভালে দেখেছে মমতা, সঙ্গে চঞ্চল। আগে-দেখা-নেই এমনভাবে নিশ্চয়ই আর একবার দেখবে। সঙ্গে থাকবে সঞ্জয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসন্তকালের বৃষ্টি যেমন হয়, চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে থেমে গেল। গ্লোবের পিছনের দরজা দিয়ে আমি ম্যাজ লেনে বেরোই।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। আজই সকালবেলা, শীতের মুখোশ খুলে হঠাৎ বসন্ত! হাতে ছুরি। তার অনুপ্রবেশ হয়ত ঘটেছিল রাতারাতিই; কিন্তু কখন, তা টের পাওয়া যায়নি। ভোর হতে না হতেই, কলকাতার সমস্ত গেরস্তবাড়ি ও সবক'টি বেশ্যাপল্লী, হাসপাতাল, কারাগার— সব তার দখলে। ধমনীস্রোতের সঙ্গে বহে-চলা এই ফুরফুরে হাওয়া থেকে আজ রেহাই নেই কারোরই। সকাল থেকে বইছে তো বইছেই।

বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে, বাতাসে ইলশেগুঁড়ি রয়েছে এখনও। ম্যাজ লেনের ওপর শিলগুলো সব গলে যায়নি। বৃষ্টি-শেষের কনে-দেখা আলো লেগে হলুদ মুক্তোর মতো গলিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ কী যে হল আমার। আমার মনে জেগে উঠল একটা সদ্য-টাঙানো ঝকঝকে সাইনবোর্ড— IGLOO, নীল ক্যাপিটাল বর্ণমালার মাথায় পুঞ্জীভূত বরফ। মনে পড়ল, এই সেই জলস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি।...

আমি দক্ষিণে তাকাই। বসন্তের মনোরম বাতাস মিহি, জলভারাতুর মসলিন পর্দা তুলে ধরে। সদর স্ট্রিটের একটি ঝলক আমি দেখতে পাই। উটের মতো মুখ তুলে আমি উদ্‌গ্রীব ক্ষুধাটানে সেইদিকে এগিয়ে যাই, যা ছিল, এই সেদিনও, আমাদের প্রতি সন্ধ্যার প্রিয় চারণভূমি।

সদর স্ট্রিটের মুখে দাঁড়িয়ে আমি ডাইনে-বাঁয়ে তাকাই। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, দু'চোখ ভরে দেখি। দেখি, ফুরফুরে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, মিউজিয়ামের পিছনের গেটের মুখে রাস্তার ওপর, ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে মেঘ-ভাঙা সোনালি রৌদ্ররশ্মি। বড় রাস্তা পেরিয়ে নিউ নিউমার্কেটের চালার মাথায় একফালি গোধূলি আকাশ। লাল লাল মেঘ উড়ে যাচ্ছে হুস্-হুস্ করে। কলকাতার সূর্য অস্ত যাবে ওদিকেই।

ডানদিকে স্যালভেশান আর্মি। বাঁয়ে, সুন্দরী ফেয়ারলন হোটেল। অসংখ্য টুনির ঝিকমিক ঝালরের আড়ালে, সবুজ ফেয়ারলনের খেলনা-সৌন্দর্য মমতাকে মুগ্ধ করেছে বরাবর, ওয়ান-টানের দিকে যেতে, যখনই বারবার গেছে এই পথ দিয়ে। লনের খোলা রেস্তোরাঁয় বসার কথাও হয়েছিল একদিন। একটি সিঙ্গল রুম অনায়াসে বুক করা যেত, ওখানে! দিনদুই থাকা যেত। টু-স্টার তো, কত আর, মমতা বলেছিল, দুশো নিক, তিনশো নিক! আই শ্যাল বিয়ার দা কস্ট। কাউন্টার থেকে রুম সার্ভিস ফোনে মমতার নাম ঘোষিত হলে বলা যেত, 'ও! ডু প্লিজ সেন্ড আর ইন। টু মাই রুম স্টেটওয়ে। শি ইজ আ কাজিন অফ মাইন, ইউ সি? থ্যাঙ্ক ইউ।'

এতে তো অসুবিধে হওয়ার কথা ছিল না।

ফেয়ারলন পেরিয়ে আমি ডানদিকে চৌরঙ্গি লেনে প্রবেশ করি। মার্কুইস স্ট্রিট ধরে যেতে যেতে 'যমুনা'-র আগে, হঠাৎ ডানদিকে তিন ফুট চওড়া ও মাত্র কুড়ি-পঁচিশ গজ লম্বা কিড লেন। শীর্ণতম যদি নাও হয়, মমতার মতে, নিঃসন্দেহে কলকাতার ক্ষুদ্রতম, নথিবদ্ধ গলি। এবং সন্দেহ কী, যে তাই! গলি দিয়ে বাধ্যত সামনে-পেছনে, কত না বার আমরা কিড থেকে সদর স্ট্রিটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শর্টকাট করেছি! এখান দিয়ে আজ আমি সদর থেকে কিড স্ট্রিটে যাই। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে বেরিয়ে আমি রয়েড স্ট্রিট ধরি।

রয়েড স্ট্রিট ধরে নোনাপুকুরের দিকে যেতে যেতে রাস্তার আলো সব একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। ওয়েলেসলির মোড় দিয়ে ট্রাম ঘুরছে।

আমার হঠাৎ মান্তুর কথা মনে পড়ল। ছি ছি, এ আমি কী করছি। আমার তো এখন ব্লাড রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার ঘোষালের কাছে যাওয়ার কথা। আবার কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাব ঠিক নেই। মান্তু ক'দিন ধরে একদম চুপচাপ। জ্বর আসে। ডাকলে সাড়া দেয় না।

না, মমতা নেই এমন রয়েড-রিপন-সদর-কিড-মার্কুইস স্ট্রিট কি চৌরঙ্গি বা ম্যাজ লেনের আমার কাছে আর কোনও মানে নেই। আমার অবচেতনা বোকার মতো এ-তল্লাটে ঢুকে পড়েছিল, এই সব রাস্তায় তার অদৃশ্য উপস্থিতির হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে। কিন্তু কোথায় সে?

আমি ট্রাম-রাস্তার দিকে গতি বাড়িয়ে দিই। ওখান থেকে গড়িয়াহাটের মিনি ধরব। আগে বাড়ি যাই। দেখি মান্তু কেমন আছে। তারপর ব্লাড রিপোর্ট। তারপর ডাক্তার।

মমতা না?

ধড়াস্ করে আমার বুকের মধ্যে রক্ত আছড়ে পড়ে। তারপর জমে বরফ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আমি হঠাৎ চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলি।

মমতা না হয়ে যায় না। প্রায় ষাট-সত্তর গজ দূরে ফুটপাথ ঘেঁষে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, ঠিক যেভাবে যায়। সাদা রাজহাঁস জলের ভেতর পায়ের পাতা ঠেলে ঠেলে যাচ্ছে। ফুটপাথে বড় একটা ওঠে না। ছ'মাস আগে শেষবার দেখা এই শ্রোণিভারাৎঅলসগমনাহাঁটা; সেদিন যখন পার্ক সার্কাস সেমেটারির সামনে থেকে ২৫ নং ট্রামে উঠল। বাঁ-দিকে ঈষৎ এলিয়ে থাকা সেই লম্বাপানা গ্রীবা— যখন চিন্তিত। যা ঘাড় পর্যন্ত চুলে ঢাকা। বিশেষ করে পিছনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনুসরণকারী একটি লটর-পটর রোডরোলারকে পাশ দেওয়ার জন্যে ও যখন একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে ফুটপাথে উঠল, তখন আর সন্দেহ রাখার কোনও কারণই রইল না। অবশ্য, এত কিছু দেখাবার দরকার ছিল না মমতার। ওকে চেনার জন্য ওর ছায়ার অংশবিশেষই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু মমতা? এই অসময়ে! একা? এই প্রায়ান্ধকার রয়েড স্ট্রিটে! কী ব্যাপার! ওয়েলেসলি থেকে ২৫ বা ২৬ নং ট্রাম ধরবে নিঃসন্দেহে।

হরিৎ প্রান্তরের ওপর দিয়ে চার-পায়ে হেঁটে-চলা উটের আবেগে আমি অচিরেই ওর কাছে পৌঁছে যাই। কিছুক্ষণ কাছাকাছি পিছনে হাঁটতে থাকি চুপচাপ। দেখি টের পায় কিনা!

মমতা একটু অস্বস্তি বোধ করছে। সে যে অনুসরিত হচ্ছে এটা টের পেয়েছে। যদিও একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। এলিয়ট রোডের আগে তাকাবেও না। ওখানে অনেক আলো। লোকজন।

পিছন থেকে ওর কাঁধে থর্থরে আঙুলের টোকা দিয়ে আমি ডাকলাম, 'মমতা'।

অশ্রুতপূর্ব ফ্যাঁসা আমার গলা। শুনে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। যখন ঘুরে দাঁড়াল, আমি দেখলাম মমতাই। শুধু কোনও মায়াবীর জাদুবলে এই ছ'মাসে ওর দশ বছর বয়স বেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। ক্রমে অন্যান্য প্রভেদ একে-একে যত ফুটে ওঠে—'আমি ততই মমতার ইমেজ প্রাণপণে এই অপর-নারীর মধ্যে ঠেসেঠুসে দিতে থাকি। আমি বিশ্বাস করতে চাই না, এ মমতা নয়। একেই মমতা বানাবার প্রতিজ্ঞায় আমি কুশল ভাস্করের মতো এর নাক একটু চাপা করে দিই। মুখের রেখা ও ব্রণগুলি ছেনি মেরে উড়িয়ে দিই। এর শেপলেস কোমরে আমি গভীর খাঁজ আনি ও নিতম্ব বেশ উথলে দিই এবং বলাবাহুল্য চোখদুটি করে দিই আরও আয়ত। অবশ্য, চুল, শ্রোণি, হাত-পা এগুলিতে আমায় বাটালি ছোঁয়াতে হয় না।

এত সব করে ফেলতে গিয়ে 'সরি' বলতে আমার দু-তিন মুহূর্তের বেশি সময় লেগে যায়। যে জন্যে ভদ্রমহিলা সংক্ষেপে আমাদের উদ্দেশে 'বাস্টার্ড' বলে আগের গতিতেই হেঁটে এগিয়ে যান।

না-না। এ মমতা নয়। মমতা হতে পারে না। কেননা, মমতা হলে একগাল হাসি-সহ ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই অপরিচিত 'দুঃখিত' অপর-আমিকে নিশ্চয়ই বলত, 'নো-নো। নিড নট মেনসন। আই আন্ডারস্ট্যান্ড।' ছোট করে মেপে-জুকে তো সে হাসতে শিখল না কোনও দিনই। শত্রু-মিত্র সবার উদ্দেশে ওর হাসি একটাই।

যদি একা মমতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় রাস্তায়, কী বলব, সেও আমার ঠিক করা আছে। শুধু আমি কী বলব তা নয়, মমতা যা বলবে, তাও।

মমতা বলবে, ঠোঁট ফুলিয়ে আর চোখ ছড়িয়ে, 'কতদিন পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি, তুমি দেখতেই পাওনি।'

'তোমাকে তো আমার বাইরে কোনও দিন খুঁজিনি মোমো', আমি বলব, 'তাই দেখতে পাইনি।'

এতদিন পরে দেখা। তবু ছেলেদের মতো হা-হা করে হেসে উঠবে মমতা।

'বড্ড রাবীন্দ্রিক হয়ে গেল নাকি, মসিয় আলবের কামু।'

১৩। অপর্ণাদির প্রবেশ ও প্রস্থান

'মমতা সঞ্জয়কে বাড়িতে ডেকে এনে সুখময়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে।' কয়েক মুহূর্তের বিরতি দিলেন অপর্ণাদি। তারপর বললেন, 'সুখময় ওদের বিয়ের দিন ঠিক করতে বলেছে।'

অপর্ণাদি মমতার সুদূর-সম্পর্কের মাসি। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের 'আকাশলীনা'র ফ্ল্যাটের বদলে পূর্বতন স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছেন। দুই ভাই অরুণ-বরুণের সঙ্গে ওখানেই থাকেন। ভাইরা বড় হয়েছে। একজন ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। ছোট বরুণ অর্ডার সাপ্লায়ার। মমতার বাবা সুখময় সেনগুপ্তর ব্যবসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বড়র জন্যে অপর্ণাদি মেয়ে খুঁজছেন। ইত্যাদি, এইসব মমতা আমাকে জানিয়েছে দিনে দিনে।

১৯৮৬-তে মমতার মা লাং-ক্যানসারে মারা গেলেন। তখন অপর্ণাদির কথায় মমতার মুখে নাল পড়ত। ভাঙা সংসারের দায়-দায়িত্ব গোটাটাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বহুদিন থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতেন কড়েয়ায়। তখন মাসি-বোনঝি ছিল অবিচ্ছেদ্য। 'আমাকে সংসারের কিছু দেখতে হয় না'— মাসি সম্পর্কে ঢালাও উল্লেখ করতে গিয়ে মমতা তখন প্রায়ই বলত। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ওর অপর্ণাদি ছিলেন অন্তিম লিঙ্ক উওম্যান।

তারপর ওর বাবা দাদা প্রণয়ের ব্যবসা আলাদা করে দিলেন। মমতার দাদা-বৌদি ভাইপোকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সেই থেকে ওদের সম্পর্ক ঋতুর মতো প্রেম ও ঘৃণায় বদলে বদলে যায়। অপর্ণাদিকে মমতা পরের দিকে 'মাগী' বলে উল্লেখ করেছে। বাড়িতে আসতে বারণ করেছে।

মমতার সঙ্গে পার্ক সার্কাসে ছাড়াছাড়ির সাতমাস পরে একদিন অফিসে অপর্ণাদির ফোন। পাঁচটার সময় ভিক্টোরিয়ার সামনে দাঁড়াতে বললেন। আমি যথাসময়ে পৌঁছে দেখি, উনি কিছুটা আগেই এসেছেন। শোফার এসে 'মাইজি আপকো বুলা রহি হ্যায়' বলে এক নীল অ্যাম্বাসাডরের কাছে আমাকে নিয়ে গেল।

অপর্ণাদি বললেন, 'উঠে এসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

আমি চিনতে পারলাম ওঁকে। আগে দু'বার দেখা হয়েছে। একবার চঞ্চলের 'কলেরার দিনগুলি' প্রদর্শনীতে মমতা এনেছিল। আর একবার আমরা ওঁর আমন্ত্রণে, পিটার ক্যাট-এ বসি।

আমার সঙ্গে গাড়িতে একটাও কথা বললেন না অপর্ণাদি। ড্রাইভারকে বললেন, 'তিউয়ারি, সুইমিং ক্লাব চল্লো।'

ইডেন গার্ডেনস-এর পাশে ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে, আমি না এলেও, বাবা-মার সঙ্গে মমতা এক-আধবার এসেছে। ওর বাবা বহুদিনের মেম্বার। ওর সূত্রেই এর অস্তিত্বের কথা অজানা ছিল না।

অপর্ণাদিরও দেখলাম এখানে বেশ চেনাশোনা। পুলের ধারে বেতের চেয়ারে বসলেন। 'সুলতান', বেয়ারার নাম ধরে ডেকে বললেন, 'এক ব্ল্যাক লেবেল।'

'আমি বিয়ার খাই না।'

'আচ্ছা। হুইস্কি?'

'দিনেরবেলা খাই না।'

'ঠিক আছে। সুলতান, দো জিঞ্জার টনিক লে আও। খুব সুন্দর করে এখানে। খাও ভাল লাগবে।'

তারপর হঠাৎ 'মমতা সঞ্জয়কে বাড়িতে এনে' থেকে 'বিয়ের দিন ঠিক করতে বলেছে' পর্যন্ত বললেন।

'দেখুন অপর্ণাদি। মমতা যা করতে যাচ্ছে আমি তো তাতে দোষের কিছু দেখি না। সঞ্জয় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। এগ্‌জিকিউটিভ হবে শিগ্‌গির। সল্টলেকে বাড়ি। ভাল পাত্র। সে ওকে সারা জীবনের সিকিউরিটি দেবে।' আমি বললাম, 'তাছাড়া, এ বিয়েতে আমিই তো ঘটক একরকম।'

'সুখময়ও তাই বলছে। যে, ছেলে ভাল।' অপর্ণাদি বললেন, 'কিন্তু মমতা তোমাকে ভালবাসে।'

'মমতা তো সঞ্জয়কেও ভালবাসছে। ভাল লাগছে বলেই তো মেলামেশা করছে। ভাল লেগেছে বলেই বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি মমতাকে ভালবাস।'

'দেখুন সত্যি কথা বলতে কি, হয়ত যথেষ্ট বাসি না।'

'ভাল বাসো না তুমি?' অপর্ণাদির মুখ কালো হয়ে গেল, 'মিথ্যে কথা! মমতা তোমাকে ছাড়া কারুকে জানে না। আমি ওকে চিনি।'

'সে আমি ছাড়া কারুকে এতদিন জানত না বলে। কিন্তু এখন তো জেনেছে।'

বেয়ারা দুটো টনিক দিয়ে গেল।

ব্র্যান্ডের নাম বলে আমি একটা হুইস্কি বললাম। এতে অপর্ণাদির উৎসাহ বেড়ে গেল। বুঝলেন, আমার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

'এখানে সিগারেট পাওয়া যাবে?'

সুলতান হুইস্কি রাখছিল।

'কৌনসা সিগ্রেট স্যার?'

'উইলস ফিল্টার।'

'ক্লাসিক, ডানহিল ইসব মিলতা।'

অপর্ণাদি ক্লাসিক আনতে বললেন। সিগারেট এলে একটা মুখে তুলে আমার দিকে সপ্রশ্ন তাকালেন। লাইটার দূরে থাক, আমার কাছে দেশলাইও ছিল না। সুলতান দামি লাইটার বের করে ওর মুখের কাছে ধরল। অপর্ণাদি ওকে ডেকে বললেন, 'এক ম্যাচিস। আউর শুনো, এক বিয়ার ভি লে-আনা।'

'শোনো। আর ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে আমাকে ফিরে যেতে হবে।' অপর্ণাদি বললেন, 'তুমি ঠিক করে বলো, মমতাকে তুমি চাও, না, চাও না?'

'আপনি যেভাবে বলছেন, স্ত্রী হিসেবে, সেটা ভাবতে পারি না।'

'কেন পারো না?'

'দেখুন, তার কী দরকার! বেশ তো ছিলাম আমরা। আমার পায়ে ঠোক্কর লাগলে মমতা বলত, উঃ। তাছাড়া ও তো স্বামী হিসেবে আমাকে কখনও দেখেনি। ওর বাবাও অ্যাপ্রুভ করেন না।'

'অ্যাপ্রুভ করেন না? তুমি কি ভাব একমাত্র মেয়ে সম্পর্কে সুখময়ের মনোভাব এতটাই ইনডিফারেন্ট? বাপ-বেটিতে তুমুল ঝগড়া হয়েছে তোমাকে নিয়ে। নেহাত মেয়ে বলে বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি সুখময়।'

'তাহলে?'

'তাহলে কী। তবু তো দশ বছর ধরে মমতা সম্পর্ক রেখে গেছে তোমার সঙ্গে। যায়নি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন তো আর রাখতে চায় না।' আমি বললাম, 'এখন তো সঞ্জয়। শেষদিন তো কথা দিয়ে এলই না।'

'সেজন্যে আমি খুব বকেছি মমতাকে। যা বলার নিজে বলে গেল না কেন। আমাকে দিয়ে বলাল কেন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতান বিয়ার ঢেলে দিয়ে গেছে। গ্লাসের কিনারায় ছোট ছোট চুমু রেখে একটু বিয়ার খেলেন অপর্ণাদি। ভেবেচিন্তে বললেন, 'অবশ্য ও যে নিজের মুখে বলতে পারল না, এটা ওর সততারও পরিচয় দেয়।'

আমি তাড়াতাড়ি গ্লাস শেষ করছি দেখে অপর্ণাদির মনে আশা জাগে। মুখে-চোখে তা ফুটেও ওঠে।

চেয়ার টেনে কাছে এগিয়ে এলেন অপর্ণাদি। গলা হাস্কি করে বললেন, 'শোনো অবিনাশ। তোমাকে একটা উপদেশ দিই। কেন সঞ্জয়, ভেবে দেখেছ কি? বছরের পর বছর ধরে শুধু পায়রা-প্রেম করে গেলে হয় না। শুধু কিস্ করলে হয় না। হোটেলে ঢুকে কুকুর-বেড়ালের মতো স্ট্রে সেক্স করলে হয় না। আমি সব ভাবতে পারি তোমরা কোথায় কী করো। মেয়েরা তারপরেও কিছু আশা করে। সে-সব করতে হয়। এবং সে-সবের খুব দেরি হলে, সঞ্জয়রা আসে। কিসফিস মুছে যায়।'

বলতে বলতে আবার চেয়ারে হেলান দিলেন অপর্ণাদি। ঠিক দুটো টান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রের খাঁজে রেখেছিলেন। এখন ফিল্টারে আগুন লেগেছে। আমি তাড়াতাড়ি সেটা পিষে নেভাই। জানতে চাই—

'সে-সব বলতে কী, একটু খুলে বলবেন?'

'সে-সব বলতে ঘর একটা।'

'সংসার?'

'সংসার তো বটেই।' অপর্ণাদি বললেন, 'ঘরও। বেডরুম একটা। সারারাত পাশাপাশি শোয়া। বালিশ থেকে মাথা পড়ে গেলে বালিশে মাথা তুলে দেওয়া। আচ্ছা, বলো দেখি অবিনাশ, মমতার রাতের ঘুম কি কোনও দিন তোমার রাতের ঘুমকে জানবে না? শুধু দিনের বেলা দিয়ে লাভ-অ্যাফেয়ার হয়?'

'আ-হ্যাঁ। ঘর।' আমি এতক্ষণে নড়েচড়ে বসি। ঠিক যা শুনতে চাইছিলাম। — 'আর সেই চেষ্টাই আমি গত দশ বছর ধরে করেছি।'

'তোমার তো ফ্ল্যাট রয়েছে?'

'সেখানে অসুস্থ বোন থাকে। পাগল। মমতা ও পথ মাড়ায় না। পাগলামিকে ও মনে করে ভীষণ সংক্রামক অসুখ। আমার ব্যর্থতা কোথায় জানেন অপর্ণাদি? এত বড় শহরে', মাথা নিচু করে আমি ওঁর দ্বিতীয় গ্লাস এবং বোতল ১৪৫ ডিগ্রি কোণে ধরে রাখি, 'আমি একটা আমাদের জন্যে ঘর খুঁজে পাইনি।'

'বাঃ। চমৎকার বিয়ার ঢালো তো তুমি!'

'হ্যাঁ। সুলতানের চেয়ে ভাল।'

গ্লাস শেষ হলেই সোডা-হুইস্কিতে ভর্তি করে দিয়ে যাচ্ছে সুলতান। স্ন্যাক্স রেখে যাচ্ছে। ফের একটা সিগারেট ধরিয়ে পরপর দুটো টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে রাখলেন অপর্ণাদি। নেভাব আমি।

'তুমি কি চেয়েছিলে?' দ্বিতীয় গ্লাস থেকে আরও হাস্কি শোনাচ্ছে অপর্ণাদির গলা, 'মমতা সারাজীবন তোমার মিস্ট্রেস হয়ে থাকবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিস্ট্রেস একটা শব্দ। প্রেমিকা আর একটা।' চতুর্থ পেগ থেকে আমার নেশা শুরু হয়; আমি বললাম, 'তা মিস্ট্রেসই বা হয়ে থাকবে না কেন, যদি সে আমাকে ভালবাসে? হোয়াই নট? ক্রীতদাসী হয়ে থাকবে, যদি দরকার হয়।'

আমি টেবিলে একটা ছোট চড় মারি।

অপর্ণাদি বললেন, 'এই তুমি খেয়ে নাও। আমি উঠব।'

'যাকে ভালবাসে না তাকে বিয়ে করে যদি কিছু পায়, যাকে আপনি বলছেন ভালবাসে তার মিস্ট্রেস হয়েই বা কিছু পাবে না কেন?' আমি থামি না। দৃঢ়তার সঙ্গে বলি, 'দেখুন আমি— ' কিন্তু কী বলতে চাই মনে পড়ে না।

'বোন আর ঘর ছাড়া তোমার আর কী প্রবলেম?'

'আরও আছে।' বুঝতে পারি আমার কথা একটু জড়িয়ে যাচ্ছে, 'আমি মমতার চেয়ে দশ বছরের বড় আর মমতার বাবার চেয়ে ষোল বছরের ছোট।'

'যাঃ! এটা কি কোনও কথা হল?' অপর্ণাদি হাসতে শুরু করলেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন অপর্ণাদি। 'সে তো তাহলে সুখময় আর আমার ডিফারেন্স প্রায় পনেরো।'

না, কথাটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়নি অপর্ণাদির। বললেন, 'আমি কি বলতে চাইছি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তুমি নিশ্চয়ই জানো। মমতা কিছুটা বলেছে তোমাকে নিশ্চয়ই।'

এই প্রথম আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছেন অপর্ণাদি। কিছুটা ঠাণ্ডা, নিশ্চয়ই কঠিন, অনেকখানি বেপরোয়া এই চেয়ে থাকা; ঠিকই। কিন্তু এর কোনও একটি ভেবে নিতে গেলেই কী ভয়াবহ ককেটিশভাবে অন্যরকম হয়ে যায়। টিভি-র সংবাদ পাঠিকা গীতাঞ্জলি আইয়ারের মতো ছোটখাটো চেহারা, তেজি এবং টরটরে। কথা বলার সময় ঠোঁটের উদ্ধত পাউটিং। পুরুষ-খেপানো হাস্কি গলা। মমতা কী বলবে আমাকে? আমার বুকের মধ্যে মেঘের নরম যখন ঘনিয়ে উঠছে তার শরীর জুড়ে— মমতা একদিন স্বীকার করেছিল আমি প্রথম পুরুষ হলেও, তার জীবনে একজন নারী ছিল। কিন্তু নাম তো বলেনি কিছুতেই। আমি ভাবতাম প্রদীপের সলতে উস্কে দেওয়ার জন্যে এ-সব ওর একধরনের কাঠির খোঁচা। সাবালক যৌন-কর্মে এমন কত রতিবর্ধক সরবরাহ করে থাকে মেয়েরা, করে না? কত নিজস্ব ধরন থাকে। আর, সে-সবে কাজও দেয়। বিছানায় যে-কোনও ইচ্ছে জেগে-ওঠার আগে, বুঝে নিয়ে, তার পূরণ করে দেওয়ার ব্যাপারে মমতার জুড়ি তো এ শহরে আর পাওয়া যাবে না।

অপর্ণাদি চুপ করে প্রতিক্রিয়া দেখছেন আমার।

ওঁর কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। আমার এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে, মমতাদের ড্রাইভারের নাম তেওয়ারি না? ওর বাবারও তো একটা অ্যাম্বাসাডর আছে। তার রঙ নীল কি না জানি না বলেই আমার এতদিন ধারণা ছিল সাদা। তাই বুঝতে পারিনি।

'শোনো অবিনাশ। আমি এবার উঠব। আমি কেন এসেছি তোমাকে বলি। আমি মমতাকে মেয়ের মতো ভালবাসি। আমি জানি, সে ভালবাসে তোমাকে। কিন্তু এছাড়াও আমার একটা স্বার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। আমি আর সুখময় আজ আট বছর অ্যাজ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ লিভ করছি। হ্যাঁ, ওর স্ত্রীর মৃত্যু আর আমার ডিভোর্সের আগে থেকে। প্রণয় আপত্তি করেছিল। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। আমরা বিয়ে করব। কিন্তু মমতার বিয়ের আগে সুখময় রাজি নয়। মমতা যদি—'

'কিন্তু সে তো' বাধা দিয়ে আমি বলি, 'সঞ্জয়ের সঙ্গে হতে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু মমতা চায় না, আমাদের এই বিয়ে হোক। সে এই বিয়ে ভেঙে দিতে চায়। সে মনে করে এতে তার মা-র স্মৃতির অপমান হবে। আমি অনেক বুঝিয়েছি মমতাকে। যে, যারা মৃত তারা মৃত। জীবনের প্রয়োজন জীবনকে।' চশমার ভেতর দিয়ে তর্জনী ঢুকিয়ে চোখের কোণ মুছলেন অপর্ণাদি, 'আমারও তো একটা ছেলে ছিল। এয়ারফোর্সে ঢুকেছিল। মিগ চালানো শিখছিল। আকাশে জ্বলে গেল। তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই? তবু তো আমি—'

'হ্যাঁ। কিন্তু বিয়ে তো হতে যাচ্ছে। দেখুন।'

আমার নেশা অনেকটা কেটে গেছে। আর কথা বাড়াতে চাই না এমনভাবে আমি বলি, 'আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, চুরি, ডাকাতি বা ভিক্ষে করে জীবনে কিছুই পেতে চাই না।'

অপর্ণাদির চোখ আস্তে আস্তে ফের সংজ্ঞা-বদল করছে। মুখের রঙ বদলাচ্ছে কালোর দিকে। চশমা ঝুলে এসেছে নাকের ডগায়। প্লাক-করা ভ্রূ ভাসিয়ে, কখনও চশমার ভেতর, কখনও বাইরে দিয়ে উনি আমাকে দেখছেন। একটা মিশন নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে, মনে হয়, বুঝতে পেরেছেন। কপালের দু'পাশে উড়াল-নেওয়ার আগে পাখির নামানো ডানার মতো দু'গোছা চুল।

তারই একগোছা হাত দিয়ে তুলে বুকের ভেতর থেকে ছুরি বের করলেন অপর্ণাদি, 'আমার স্বার্থটা কোথায় প্রিসাইজলি তোমাকে বলি। বাবার ওপর মমতার ভীষণ জোর। বাবাকে খুশি করার জন্যে ও সঞ্জয়কে বিয়ে করতে যাচ্ছে। যাতে ওর জোর বাড়ে। যাতে আমাকে আটকাতে পারে। প্রণয়কে ফিরিয়ে আনতে পারে।'

'তাই আপনি...'

'না-না। আমি ভালবাসি মমতাকে। মেয়ের মতো ভালবাসি। আমি বিশ্বাস করি ভালবাসায়। তাই আমি সুখময়কে চাই। ওর টাকার জন্যে নয়, যা মমতা ভাবছে। তুমি বিশ্বাস করতে পারো আমাকে।' অপর্ণাদি আমার হাত চেপে ধরলেন, 'তুমি বিশ্বাস করো আমাকে অবিনাশ। আমার নিজের যথেষ্ট আছে। টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি সব তোরা নিয়ে নে, আমি মমতাকে বলেছি। আমি শুধু সুখময়কে চাই। সব ফেলে সুখময়কে আমার ফ্ল্যাটে এসে উঠতে বলেছি। আমার ভাইদেরও আপত্তি নেই। কিন্তু মমতা এ বিয়ে হতে দেবে না। মমতা বিয়ে না করলে সুখময়ও কিছু করবে না। তোমাদের বিয়েতে আমার স্বার্থটা কোথায়, এরপর নিশ্চয়ই তোমাকে খুলে বলতে হবে না।'

না। আমি বুঝতে পেরেছি। সঞ্জয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে মমতার জোর বাড়বে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করলে মমতার বাবা খেপে যাবেন। মুখদর্শন করবেন না। মমতার বাবার ওপর মমতার কোনও জোরই আর খাটবে না। সব বাধা দূর হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাপিনী যখন ফণা তোলে, বিশেষত সুন্দরী বিষধরী যারা, যেমন চন্দ্রবোড়া, দুধগোখরো, কি নীল শরীরের ওপর ছোট-ছোট চুনী-বসানো কালনাগিনী বা চিত্রালী শাঁখামুটি— আমরা ভাবি ছোবল। কিন্তু হয়ত সে দেখায় তার শরীরটাই। নইলে কি আর কোমর থেকে অতখানি তুলে ধরত। অতক্ষণ ধরে শরীর দোলাত।

'আই অ্যাম ফরটি-ওয়ান', ঊর্ধ্বাংশ তুলে ধরে, শরীর দুলিয়ে অপর্ণাদি বললেন, 'আই ক্যান রিজনেবলি হোপ টু বিয়ার হিম আ সন। অলসো আ সিস্টার ফর মমতা, গড উইলিং।'

'মাই গুডনেস' ঘড়ি দেখে চমকে উঠলেন অপর্ণাদি, 'ওঠো, ওঠো। সুখময় বসে আছে অফিসে। আটটার মধ্যে ফিরতে বলেছিল। আর হ্যাঁ, এই নাও', হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা বন্ধ খাম বাড়িয়ে দিলেন অপর্ণাদি, 'মমতা তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে।'

গাড়িতে অপর্ণাদি বললেন, 'চিঠিটা পড়বে না?' আমি বললাম, 'পরে পড়ব।'

ধর্মতলায় নামিয়ে দিলেন। জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'ভেবে দেখো। আমি সাহায্য করব।'

সাড়ে আটটা। আমি চঞ্চলের খোঁজে ছোট ব্রিস্টলে ঢুকলাম। বার ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। দুশো লোক গাদাগাদি করে বসে আছে। দেওয়াল-ঘেঁষা একেবারে শেষের টেবিল থেকে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন প্রকাশ কর্মকার। উনি যখন হি-হি করে মাতাল হয়ে হাসেন, ওঁকে অবিকল আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ছবির মতো দেখায়। তেমনি গোঁফদাড়ি। রোমবহুল প্রশস্ত বুকের পাটা। দেখলাম, চঞ্চল পাশেই বসে আছে।

'আয়, আয়, খেচর'— চঞ্চল হাসতে হাসতে ডাকল।

বুঝলাম, খচ্চর বলতে চায়।

১৪। এখানে সূর্য ওঠে না

সঞ্জয়কে আমি দেখিনি। আজ দেখলাম। এ-এ, সানগ্লাস পরে নাকি। বলেনি তো মমতা।

কোনও একটা পাহাড়ি জায়গা। আমি আর মান্তু। আমরা স্বামী-স্ত্রী। মাঠের প্রান্তে শালজঙ্গলের ধারে আমাদের কোয়ার্টার।

প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধূলিধূসর জিপ চালিয়ে সঞ্জয় এল। জিপের মাথায় লাগেজ। একটা রাইফেল। লটরপটর একখানা আস্ত চাঁদ।

মান্তু আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। আতঙ্কিত। 'সঞ্জয় এসেছে।'

সঞ্জয়কে দেখলাম এই প্রথম। খুব স্বাস্থ্যবান। এত পেশিবহুল?

যদিও বামন। সবসময় বুক চিতিয়ে আর মুখ তুলে। চোখে সানগ্লাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে কোথাও একটা জলা আছে। সঞ্জয় বিড়বিড়িয়ে বলে! 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি।' মান্তু বলল, 'ভুরভুরাইয়ার চর।' বুক চিতিয়ে আর মাথা উঁচু করে সঞ্জয় জানতে চাইল, ওই জলায় এবার কি রাজহাঁসগুলো এসেছে?

কোথা থেকে এসে গেল মমতা। বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছে।'

একটা কালো রাজহাঁস। সে কি এবার এসেছে?

অভ্রভেদী একটা গাছের কাণ্ড। ডালপালা নেই। রবার গাছের মতো। উত্তুঙ্গ। নরম। কিন্তু ঋজু। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠে তার আগ্রহ ব্যক্ত করছে। আরও সটান হতে চাইছে।

তার গা থেকে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা আঠা।

তার গুঁড়ির কাছে আগাছা।

মমতা— এখন ফ্রক-পরা বালিকা— ঋজু, নরম, উত্তুঙ্গ ও পিচ্ছিল কাণ্ড ধরে উঠছে। অঙ্কের বাঁদরের মতো এক-একবার সে অনেকখানি পিছলে নেমে আসছে। যতবার আছড়ে পড়ছে এভাবে, শোনা যাচ্ছে তার গোঙানি— উঁউম! দুই ঊরুর বেড় দিয়ে না-ছোড় প্যাঁচে সে ফের জড়িয়ে ধরছে কাণ্ড। পিছলে যেতে যেতে আবার উঠছে। সে উঠছে আর পড়ছে। পড়ছে আর উঠছে।

এরকম ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে একবার সে গাছের ডগার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তারপর পিছলে এক লহমায় গুঁড়ির কাছে নেমে আসে।

গুঁড়িতে ভিজে আগাছা।

মান্তু এগিয়ে আসছে। তার মাথা নিচু। ফ্রক ছিঁড়ে গেছে। মুচড়ে দুমড়ে গেছে তার ফুলগুলিও। ইজের ভেসে গেছে রক্তে। শীর্ণ ঊরুদ্বয় দিয়ে রক্তের দুটি ধারা নেমে আসছে।

সঞ্জয়: দেখতে পেলে?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা কালো রাজহাঁস এসেছে।'

মমতাকে জিপে রেখে আমি আর সঞ্জয় জলা ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছি। জল হাঁটুসমান। বুক অবধি ঘাস। মাইল মাইল জলার প্রান্তে চাঁদ উঠছে। নিঃশব্দে আলো বাড়াচ্ছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে চরাচর। জলে ভেসে রয়েছে হাজার হাজার সাদা হাঁস।

রাইফেল তুলে, সঞ্জয় একগুলিতে চাঁদ-ওঠা বন্ধ করে। প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক। জল ছেড়ে বাতাসে ভেসে ওঠে হাজার হাজার সাদা হাঁস। স্তব্ধ চাঁদের আলোয় দেখা যায়, গুলি লেগেছে কালো রাজহাঁসের গায়ে। তবু যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে সে ধীর ও স্থির জলে ভেসে চলেছে।

তাকে ঘিরে তার সঙ্গে চলেছে তার রক্তে-মেশা লোহিতবর্ণ জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমতা চিৎকার করে বলল, 'ওকে মেরে ফেল।'

সঞ্জয় বলল, 'না'।

তারপর চামড়ার জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা রিভলভার বের করল।

দুম-দুম-দুম-দুম-দুম-দুম।

চেম্বার খালি করে সঞ্জয় ছ'বার গুলি করল। রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জলায়।

প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক।

আবার! হাজার হাজার হাঁস আমাদের দু'জনকে ঘিরে। আমি আর সঞ্জয়। তারা আমাদের মাথার চারিপাশে। তারা আমাদের বুকের চারিপাশে।

আমরা থামি।

তারা থেমে যায়।

ফ্রক পরা মমতা এগিয়ে আসছে। ইজের ভিজিয়ে তার দুই ঊরুর ফাঁক দিয়ে টপ-টপ করে রক্ত পড়ছে। অঞ্জলি পেতে সে সেখান থেকে এক আঁজলা রক্ত নেয়। তারপর ধীরে হাত মুঠো করে।

মাস্তুর পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে।

১৫। বোনের সঙ্গে তাজমহলে

যা ছিল একটা সম্ভাবনা, অথচ সতর্ক না থাকলে না ঘটতেও পারত, তাই হল। শেষ পর্যন্ত, আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটল।

২১ ডিসেম্বর সকালবেলা মাস্তুকে পাওয়া গেল বাথরুমে। ঝুলছে।

দরজা ভাঙতে হল না। ভুলে গিয়েছিল বন্ধ করতে। ভেজিয়ে রেখেছিল?

রবিবার। বী-হাইভ ভেঙে পড়ল। লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলে পুলিস এসে বডি নামাল।

ওসি প্রণব মাইতি বললেন, 'এ ক্লিন কেস অফ সুইসাইড। পোস্টমর্টেম দরকার হবে না।'

ডাঃ ঘোষাল সার্টিফিকেট লিখছিলেন। ওসি জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলুন তো ডক্টর... ডক্টর...'

'ডক্টর ঘোষাল।'

'ডক্টর ঘোষাল। আপনি তো একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। আচ্ছা কী ব্যাপার বলুন তো। এই পাগলরা হ্যাঙ্গিং ছাড়া আর কোনও মেথড ইউজ করে না কেন? জল, আগুন, স্লিপিং পিল, ওর নাম কী, ছুরি, বঁটি— কত কী তো রয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাঃ ঘোষালকে মাস্তুর বয়স-টয়স বলে দিচ্ছিল ওপরের ফ্ল্যাটের কৃষ্ণা: মিসেস গাউর। কৃষ্ণা আমার কাছে উঠে এসে জানতে চাইল,

'ওর হাজব্যান্ডের টাইটেলটা কি আছে?' অর্থাৎ মাস্তুর।

'আমি কখনও গলায় দড়ি ছাড়া দেখিনি। মানে, এই ধরনের সাইকোসোমাটিক কেসে।' ডাঃ ঘোষাল বললেন, ওসি-কে।

এক প্যাকেট নতুন ডানহিল খুলে ওসি একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন ডাঃ ঘোষালের দিকে। ডাঃ ঘোষাল বললেন, 'নো থ্যাঙ্কস। কী জানেন, অফ অল মেথডস হ্যাঙ্গিং ইজ দা ওনলি ওয়ান হুইচ ইজ হানড্রেড পার্সেন্ট প্রুফ। মনস্থির করে, পায়ের টুলটাকে শুধু ঠেলে দেওয়া। কাজ বলতে তো ব্যস এইটুকু। বাকি যা করার দড়ি করবে। প্রথমেই ঘাড়টা দেবে মটকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। এর ফার্স্ট রি-অ্যাকশন হল আপনার হাত দুটোকে ইনএফেক্টিভ করে দেওয়া। গলার দড়ি-টড়ি যে একটু আলগা করে দেবেন— সে চান্সই দেবে না। আর পা-দুটো... আচ্ছা দ্যান মহায়, একটা সিগারেট দ্যান। খাইনা যে একেবারে তা নয়।'

বলে অর্থপূর্ণ হাসলেন। অর্থাৎ এরকম সিচুয়েশানে ধোঁয়া ছাড়া পর্যন্ত প্রসঙ্গ মুলতুবি রইল। তারপর ওসি জানতে চাইলেন, হ্যাঁ। তারপর? পা দুটো?

'পা-দুটো, আ-হ্যাঁ।' ডাঃ ঘোষাল বললেন, 'পা দুটো আপনার, লক্ষ্য করবেন কীভাবে দোলে। পুজোয় ওই আম্রপল্লব টাঙায় না— অবিকল সেইরকম। ঘুরে ঘুরে। মানে, মাটি ছোঁবার জন্যে পা এমন ডেসপারেটলি চেষ্টা করে যে অ্যাঙ্কলবোন দুটো একদম মট মট করে ভেঙে যায় মহায়, বুঝলেন? হ্যাঁ, কৃষ্ণার প্রতি সশ্রদ্ধভাবে, মৃতার স্বামীর নামটি কী ভাই?'

'আমার ধারণা'— সার্টিফিকেট লেখা শেষ করে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে ডাঃ ঘোষাল বললেন—

'এই! কেউ বডির ওপর আতর-টাতর ঢেলে দিন এক শিশি। এঃ এঃ।'

'এই আর একটা ব্যাপার', নাকে রুমাল চাপা দিলেন ডাঃ ঘোষাল, 'হ্যাঙ্গিং কেস খানিকটা বাহ্যে করে ফেলবেই।'

'আমার ধারণা, অবশ্য এটা একেবারেই ব্যক্তিগত ধারণা আমার।' ডাঃ ঘোষাল বললেন ওসি প্রণব মাইতিকে, 'এই সুইসাইড করার আগে প্রতিটি পাগলই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। নইলে এত মেটিক্যুলাসলি প্ল্যানিং করে কী করে। কোথাও তো পাগলামি চিহ্ন মাত্র দেখি না। আপনি তো এমন অনেক কেস দেখেছেন। মিস্টার... মিস্টার...

'প্রণব মাইতি।'

'প্রণববাবু! পাগলের সুইসাইড অ্যাটেম্পট কখনও ফেইল করতে দেখেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল ছিল সেকেন্ড স্যাটারডে। বলতে গেলে সারাদিনই ছিলাম বাড়িতে। সেই সকালবেলায় যা একটু অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল। (কেন না, তার চেয়ে স্বাভাবিক আচরণ আর কিছু হতে পারে না।)

'দাদা একটা কথা বলব, সত্যি কথা বলবি?

সকালবেলা চা দিতে এসে হঠাৎ অনুরোধ রাখল মান্তু। মুখ হাসিখুশি। দেখলাম, এই শীতে ওর স্নানটান সারা। সাতসকালে বেশ রীতিমত সাজগোজ করেছে আজ। এমনকি গয়নাও পরেছে দু-একটা। (রণেন সব ফেরত দিয়ে গেছে।) যদিও মমতা-অপর্ণাদি-মদ্যপান সব মিলিয়ে এ ক'মাস খুবই নেগলেক্ট করেছি মান্তুকে আর সে কথা যখন মনে পড়ে মর্মে মরে যাই— কিন্তু আজ তো বেশ ভালই দেখাচ্ছে ওকে। তবে, রোগা হয়ে গেছে। বড় রোগা হয়ে গেছে! মনে পড়ল মাস তিনেক আগে একদিন সন্ধেবেলা, যেদিন ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল, আর ডাঃ ঘোষাল বলেছিলেন, গোবরা মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি করতে— সেদিন যে কী ভয়াবহ কাণ্ড! দরজা খুলে আলো জ্বালাতেই দেখি মান্তু শুধু শায়া পরে আমার বিছানায় চুপচাপ বসে। হাঁটুতে থুতনি। আলো জ্বালাতেই যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠেছিল, 'আঃ' বলে।

শাড়ি পড়েছিল মেঝেয়। ব্লাউজ বিছানার তোশকের নিচে গোঁজা। ব্রেসিয়ার গ্যাস-সিলিন্ডারের গায়ে। আমাকে বলেছিল, 'না। খবর্দার। মমতাদির সঙ্গে তুমি মিশবে না।'

অবশ্য আমাকে ও চঞ্চলও ভেবে থাকতে পারে। কথাগুলো ধ্বনিমাত্র ওর কাছে তখন। মানে জানে না। নিজের হাতে ওর বুকে ব্রেসিয়ার আটকে দিতে গিয়ে সেদিনই প্রথম চোখে পড়ে, এত ছোট্ট হয়ে গেল মান্তু কবে। আর কী করে! এ তো সেই দশ বছরের ফ্রকপরা মেয়েটা।

সে তুলনায় গতকালের ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলব না তো কি, যদিও এখন মনে হচ্ছে তার চেয়ে অস্বাভাবিক আর কিছু হয় না।

'বল না দাদা। সত্যি বলবি কিনা।'

'বলব। বল রে।'

'যা সত্যি তাই বলবি কিন্তু। ঠিক?'

'ঠিক।'

'আচ্ছা দাদা, আমার বয়স এখন কত?'

'তিরিশ।'

'না বত্রিশ।'

কাল সকালে ছিল দারুণ কুয়াশা। এমন যে, গলির ওপারে রায়েদের বাড়ির ছাদের পোলট্রি ঘরটাও দেখা যাচ্ছিল না। শুধু ডানার ঝটপট। মাঝে মাঝে।

'আচ্ছা, দাদা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধ্যুর!' আমি এক ধমক লাগাই, 'কী বলবি বল।'

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে মান্তু জানতে চাইল, 'আমাকে কি এখনও মেয়েমানুষ বলে মনে হয়?'

'তোকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'কী সুন্দর? মেয়েমানুষের মতো কিনা বল?'

মুগ্ধ চোখে আমি অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখি।

'যাঃ। বল না।'

যা সত্যি আমি ওকে তাই বললাম।

'হ্যাঁ, মেয়েদের মতো।'

'সত্যি বলছিস?'

'সত্যি।'

ডাঃ ঘোষাল ঠিকই বলেছিলেন ওসি-কে। কাল থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিল মান্তু। কিন্তু সে তো, ডাক্তারি পরিভাষায়, মেডিক্যালি! আসলে, সেটাই ছিল ওর চূড়ান্ত অসুস্থতা। আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি ডাক্তার নই। আমি মান্তুর দাদা।

পৃথিবীতে আমার একমাত্র আত্মীয় তাহলে আমাকে এভাবে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারত না।

১৬। 'আমি যাব। বলব। আর ফিরে আসব।'

খবর পেয়ে সঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে চঞ্চল চলে এল।

দায়দায়িত্ব যা কিছু সব ওরাই কাঁধে তুলে নিল। কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লিতে লম্বা লাইন। ওরা সাবেক শ্মশানে বডি নিয়ে গেল।

শ্মশানে চঞ্চল আমাকে বলল, 'অত্যন্ত নেগলেক্ট করেছিস তুই মান্তুকে।'

হাঁটুতে মুখ গুঁজে রেখে, কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, 'হ্যাঁ। এই সময়েই মমতার ব্যাপারটা না হলে—'

'ওকে একটা অ্যাসাইলামে দিলে অনেকটা প্রোটেক্টেড থাকত। যাক গে, যা হওয়ার তা তো হয়ে গেল।'

বলে ও প্রসঙ্গে ছেদ টানতে চাইল। আমার হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, বোধবুদ্ধিহীনভাবে হলেও, মান্তু তো চঞ্চলকে ভালবাসত। সে কি চঞ্চলের কাছেও কিছুটা প্রোটেকশন পেতে পারত না? নিভন্ত চিতা থেকে পোড়া নরমাংসের গন্ধ এসে আমাকে জানাল, না যেও না। মন এবং শরীরের—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের— সে অনির্ণেয় তৃতীয়মাত্রার হকদার কেউ হতে পারে না। না ব্যক্তি, না সমাজ, না রাষ্ট্র। নাঃ, কেউ না।

'যেভাবে অসুখ বাড়ছিল, ডাঃ ঘোষাল তাই বলেছিলেন। গোবরায় জানুয়ারির শেষে নেবে বলেছিল। পুরো পাগল তো ছিল না।' আমার নিঃশ্বাস কেটে কেটে পড়ছিল, 'মাঝে মাঝে ভাল থাকত। বোঝা যেত না। তাছাড়া মমতার ব্যাপারটা', মাথা না তুলে মাটির দিকে তাকিয়ে আমি বলে যাই, 'পুরো পাগল থাকলে তো এরকম করত না। যখন ওরা এরকম করে, তখন এরা, তখন এরা, একদম সুস-সুস্থ হয়ে যায়।'

বহুকাল পরে, বোধহয় সেই ছোটবেলার পর, শ্মশানের মাটিতে আমার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। সেই কোন বিস্মৃত বাল্যদশার পর বোধহয় তো এই প্রথম।

চঞ্চল কাঁধে হাত রাখে আমার।

'মমতার খবর কী?'

'চিঠি দিয়েছে।'

'সে কী। কবে?'

'পরশু।'

'কী লিখেছে?'

'পড়িনি।'

'সে কী। কেন?'

'মনে ছিল না।'

'পড়বি না।'

'না। ও আর... কী হবে পড়ে।' বুক ভরিয়ে নিঃশ্বাস টেনে আমি বলি, 'হিপ-পকেটে আছে। তুই বের কর।'

বলে শ্মশানের মাটিতে প্রায় আভূমি উপুড় হয়ে আমি ওকে সুযোগ করে দিই।

খাম বের করে চঞ্চল বলল, 'নে।'

ধোঁয়ায় আমার চোখ জ্বলে যাচ্ছে। সদ্য আগুন দেওয়া চিতার প্রান্তে এখনও দেখা যাচ্ছে মান্তুর আলতা-পরা ছোট ছোট পা-দুটি।

আগুন এসে এইমাত্র একবার চেটে যায় পা-দুটি। মান্তুর পায়ের অ্যাঙ্কলবোন কি, মাটি ছোঁবে বলে, মাটি ছুঁতে গিয়ে, মট-মট করে ভেঙে যাচ্ছে?

আমার চূড়ান্ত অবহেলার কারণেই মান্তুর আত্মহত্যা। মমতার জন্যে আমার উদভ্রান্তিই সে-অবহেলার কারণ। মান্তুর মৃত্যুর জন্যে কি মমতা কোনও ভাবেই দায়ী নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। আমি পড়ব না। তুই চিঠিটা মান্তুর চিতায় ফেলে দিয়ে আয়।'

এতক্ষণে খাম খুলে ছোট্ট চার লাইনের চিঠিটা পড়ে ফেলেছে চঞ্চল। বলল, 'সে কীরে। আজই তো দেখা করতে বলেছে তোকে।'

হাঁটু থেকে মুখ তুলে আমি বললাম, 'আজ?'

আজ সকাল থেকে কনকনে উত্তুরে হাওয়া। নিভে-যাওয়া চিতা থেকে ছাই-এর ঝাপ্টা এসে মুখে লাগে। চশমার কাচ ভরে যায় ছাই-এ। এখন শুধু মান্তুর জ্বলন্ত চিতা। সেখান থেকে আগুনের ফুলকি উড়ে আসছে তো আসছেই। শুধু আমারই দিকে।

'কখন?'

'চারটের সময় বলেছে। কিড স্ট্রিট বাসস্টপে। কিন্তু এখনই তো চারটে।'

ওর হাত থেকে আমি চিঠিটা নিই।

কে যেন আমাকে তুলে দাঁড় করায়।

'কী ব্যাপার।'

'আমি একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মমতার কাছে।'

চঞ্চলের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজন তরুণ কবি। নাম আর্যনীল। আর্য বলল, 'সে কী অবি'দা। এখন যাবেন কোথায়। ডেডবডি ছেড়ে?'

চঞ্চল বলল, 'পাগল নাকি তুই। কত পারাফার্নেলিয়া বাকি। অ্যাশেস নেওয়া। গঙ্গায় যেতে হবে স্নান করতে।'

আর্য বলল, 'আমি অনেক মড়া পুড়িয়েছি। এরকম কখনও দেখিনি।'

আমি চঞ্চলকে বললাম, 'বডি পুড়তে আরও ঘণ্টা দুই। আমি তার আগেই আসছি। তুই থাক। আমি ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে ফিরে আসব। কোথাও যাবি না।' গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি চিৎকার করে বললাম, 'চিতায় ঢালার জন্যে আমি গঙ্গাজল আনব।'

গেটের মুখে ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে উঠেই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি যাব। দেখা করব। আর চলে আসব।

আমি একটুও উত্তেজিত হব না। শুধু একটা কথাই বলব মমতাকে। এবং শান্তভাবে। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। অ্যান্ড। আই। হেট। ইউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দুটো বাক্য বলে শ্মশানে ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে। একঘণ্টা। দেড়ঘণ্টা লাগুক। মমতার প্রতি আমার এই অমোঘ উচ্চারণই হবে সেই প্রকৃত গঙ্গোদক— যা ঢেলে আমি মাস্তুর চিতা নেভাব। রেপড্ শুধু মাস্তু হয়নি। হয়েছি আমিও।

তবে আমি যাব, বলব, আর ফিরে আসব। আমি ট্যাক্সি ছাড়ব না।

১৭। বাসস্টপে কেউ নেই

পৌঁছলাম ঠিক সাড়ে চারটেয়। আধঘণ্টা দেরি হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট পেরোলেই, ট্যাক্সি থেকে কিড স্ট্রিটের মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। মমতা তো নেই-ই। দেখলাম বাসস্টপে কেউ নেই। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েই বুঝলাম ভুল করেছি।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে আমি ফিরে যাওয়ার জন্যে পাগলের মতো পরপর ট্যাক্সি ডাকছি, দেখি মমতা আমার পাশে দাঁড়িয়ে। তার গায়ে বড়বাজারের কেনা সেই কালো শাল। কালিম্পঙের তিব্বতি বালা এখনও খোলেনি।

বলল, 'শিগ্‌গরি এসো আমার সঙ্গে।' বলে ও কিড স্ট্রিটের দিকে আমার আগে আগে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

জিওলজিক্যালের পেছনের গেট দিয়ে রাস্তাটি আমাদের বহু পরিচিত। বাঁদিকের পুকুর পাড় দিয়ে যেতে যেতে মমতা বলল, 'সোয়েটার পরোনি?'

পুকুর পেরিয়েই আশুতোষ গ্যালারি। বন্ধ। আমরা অন্ধকার সিঁড়িতে বসলাম। আমাদের পিছনে গোটা মিউজিয়াম অন্ধকার। শুধু ওদিকে একতলায় মডেলিং-এর ঘরগুলোয় কাজ হচ্ছে। ওখানে আলো। গেট হয়ত সে জন্যেই খোলা।

বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে সব সময় যা, মমতা আগের মতো ঝরঝরে হাসি হেসে জানতে চাইল, 'এত উস্কোখুস্কো কেন?'

এখনও কত সস্নেহ ওর কণ্ঠস্বর। যেন, আমা-বই আর কিছু জানে না!

'কেন ডেকেছ বলো?'

'দ্যাখো', মমতা আমার হাঁটুতে হাত রাখল, 'ডেকেছিলাম একটা কথা বলব বলে। কিন্তু, বলছি আর একটা কথা। এসেছি পৌনে চারটেয়। তারপর ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আমি মেট্রো রেলের পার্ক স্ট্রিট গেটের মুখে দাঁড়িয়ে। ওখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখলাম প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে। ট্যাক্সি ডাকছ। তারপর তোমার কাছে এলাম।'

আমি চুপ করে আছি।

'আমি বোধহয় আজ আমার জীবনের চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলাম। শুনবে কী হয়েছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলো।'

'খুব ইন্টারেস্টিং।' জীবনের চরম সঙ্কট, কাজেই ফের একগাল হাসি, 'আমার হঠাৎ ভয় হল, আমি বোধহয় আজ সঞ্জয়কেই আসতে বলেছি। আর এইখানে। কারণ, তুমি তো দেরি কর না কখনও। সঞ্জয় করে। আমি এখনও জানি না, সঞ্জয়কেও বলেছি কিনা। হয়ত সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে।...

'কে আসবে তুমি না সঞ্জয়, সঞ্জয় না তুমি, ঠিক করতে না পেরে আমি ওই মেট্রো গেটের কাছে সরে গিয়ে সেই পৌনে চারটে থেকে বাসস্টপটা লক্ষ্য করছি। যে কে আসে, তুমি না সঞ্জয়? সঞ্জয় না তুমি।...

'তারপর থেকে আমি সঞ্জয়ের মতো দেখতে প্রতিটি লোকের মধ্যে সঞ্জয় আর তোমার মতো দেখতে প্রতিটি লোকের মধ্যে তোমাকে খুঁজছি। খুঁজতে খুঁজতে মাথার ভেতরটা কেমন হয়ে গেল। সরু-মোটা, বেঁটে-লম্বা সব একাকার হয়ে গেল। বয়সেরও আর গাছ-পাথর রইল না। শেষে এমন হল, বিশ্বাস করবে?' আমার হাঁটুতে চাপ দিয়ে মমতা বলল, 'আমি দেখলাম, আমি সঞ্জয়ের মতো লোকের মধ্যে তোমাকে, আর তোমার মতো লোকের মধ্যে সঞ্জয়কে খুঁজছি। উঃ, পাগল হওয়ার উপক্রম! সত্যি, যা ভয় পেয়েছিলাম না!'

পাগল? আমার মান্তুর কথা মনে পড়ল। চিতা। হাঁটু থেকে আমি ওর হাত সরিয়ে দিলাম।

'চল, উঠি।'

'কোথায়?'

উত্তর না দিয়ে আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে পাঁচটা। সদর স্ট্রিটে বেরিয়েই ট্যাক্সি ধরব।

যেতে যেতে মমতা বলল, 'আর এক মিনিটের মধ্যে তোমরা কেউ না এলে আমি ফিরে যেতাম।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার? বাড়িতে।'

সদর স্ট্রিট গেটের কাছাকাছি পৌঁছে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'কী বলবে বলো। কেন ডেকেছ?'

এখনও কত শান্ত আমার গলা। যেন কিছুই ঘটেনি আজ সারাদিনে।

'চল না। ওয়ান-টানে বসি। ওখানে বলব।'

'না।' আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গলা উত্তরোত্তর কী শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, 'এখানে বলো। এখন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তারপর ওয়ান-টানে বসবে তো?'

আমি উত্তর দিলাম না। অফিস আর মিউজিয়ামের মাঝখানে গাড়ি-বারান্দার নিচে আমরা। রবিবার। জনপ্রাণী নেই। গেটের ওপারে সদর স্ট্রিট দিয়ে একজন একাকিনীকে নিয়ে একটা রিকশ গেল সস্তা হোটেলগুলোর দিকে।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। এবং আঙুল পুড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নেভালাম না। যখন মমতা আমার বাঁ-হাত জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, 'দেখো অবিনাশ, ষোলই মার্চ না এসে আমি খুব অন্যায় করেছি। অপর্ণাদিকে দিয়ে ফোন করানোও খুব ভুল হয়েছে।' হাত নাড়া দিয়ে বলল, 'আর এ-জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। দু দুটো অ্যাফেয়ার একসঙ্গে— আমি সত্যি আর পারছিলাম না। কিন্তু, আমার উচিত ছিল নিজে এসে তোমাকে বলে যাওয়া।'

দেশলাই কাঠির আলোয় মমতা এই দ্বিতীয়বার। নাকি তৃতীয়? সত্যিই অন্যরকম দেখায়। অচেনা লাগে।

'তুমি কি আর কিছু বলবে?'

'আমি আর সঞ্জয় বিয়ে করছি। ১৮ জানুয়ারি। আমি নিজে তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।' বরাবরের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'তুমি তো এই চেয়েছিলে।'

আমার হঠাৎ খুব শীত করে উঠল। যা কনকনে হাওয়া, শীত তো করবেই। কিন্তু, মান্তুর চিতার আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সে হাওয়ায়। আমি প্রাণপণে নিজেকে শাসন করতে চেষ্টা করি। আমি কি কিছুতেই সেই জায়গায় ফিরে যেতে পারি না, যেখানে ছিলাম এতক্ষণ।

'তুমি কি আর কিছু বলবে?'

এতক্ষণে মমতা হাত ছেড়ে দেয় আমার। এর পরেও সে আর কী বলবে? সে আমার দিকে তাকায়। এই সেই বেশ ভোঁতা, আর ব্যঞ্জনাহীন চাহনি— চোখে চোখ বসিয়েও যার কোনও নাম আমি কোনওদিন দিতে পারিনি, বা, যখনি সে চেষ্টা করেছি, আলুলায়িতভাবে আঁচল লুটিয়ে সে সরে সরে গেছে। হাত ছেড়ে দিয়ে আমার আজকের শেষ চেষ্টাও সে ব্যর্থ করে দেবে?

ভাবনায় মাথা হেলে যায় মমতার। বাঁ দিকে।

'আজ কী হয়েছে তোমার বলো তো?'

'কিন্তু', আমার লম্বা নিঃশ্বাস আমি দেখলাম ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরুচ্ছে, 'এ-জন্যে তুমি আজ আমায় না ডাকলেও পারতে।'

'কেন, আজ কী হয়েছে?'

'কাল ভোররাতে মান্তু আত্মহত্যা করেছে। এখনও শ্মশানে। এখনও না', ঘড়ি দেখে আমি বললাম, 'এবার শেষ হয়ে এল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি শ্মশান থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ। আর এখুনি সেখানে ফিরে যাব।' পরম স্নেহ-ঝরা প্রগাঢ় গলায়, 'একটা ঘর খালি হয়েছে মমতা। আমরা একটা ঘর পেয়েছি' বলতে বলতে আমি বুঝলাম এই সেই অনির্বচনীয় কিন্নরকণ্ঠ যে-স্বরে চিরকাল প্রেমিকরা 'আমি তোমায় ভালবাসি, মেয়ে' বলে এসেছে।

কিন্তু, আমার বুকে জ্বলছে বলাৎকারের চিতা।

মমতা ফোঁস-করা গলায় জানতে চাইল, 'তুমি কী জন্যে এসেছ বলো তো?'

বলতে বলতে সে গেটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ওখানে রাস্তা। কিছু লোকজন। আলো।

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু মুচড়ে টেনে আনলাম কাছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আমার বিকৃত মুখ ওর ভয়ার্ত মুখে ঠেকিয়ে না-জানি কী রাক্ষসের হাসি হেসে আমি আবার বললাম, 'একটা ঘর খালি হয়েছে।'

আমার চোখে মমতা সম্ভবত এই প্রথম দেখতে পেল চিতার আগুন। সর্বশক্তি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে অস্ফুট স্বরে ডাকল, 'পুলিস! পুলিস!' গেটের মুখে দারোয়ান। শুনতে পেল না। আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম।

ডাইনে সদর স্ট্রিটের গেটের দিকে বাঁক নেওয়ার আগে, বাঁ দিকে একটি নির্জন তরুবীথি। পুকুরের ধার দিয়ে মোরামের সরু পথ চলে গেছে, যেখান দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম, সেই কিড স্ট্রিট পর্যন্ত। সেদিকে, লেডিজ ও জেন্টস টয়লেটের পিছনে। আমি ওকে নিয়ে গেলাম।

টয়লেটের বাইরের দেওয়ালে ঠেসে ধরে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আমি বললাম, আমার দাঁতে-দাঁত, 'তুমি একটা— তুমি একটা—' শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও দাঁতের কিটকিট শব্দের মধ্যে দিয়ে ঠিক তাই বেরিয়ে এল যা আমি বলতে চাইনি কিছুতেই, 'তুমি একটা বেশ্যা।'

তারপর... ওর দুই কাঁধ ধরে ওকে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে শুরু করেছি আমি দেখি। আর পাগলের মতো বলে যাই, 'বলো বলো তুমি কী। টেল মি। স্পিক আউট, আই সে। কাম অন! বলো তুমি কী। নিজের মুখে বলো...'

আমার কথা থামে, কিন্তু ঝাঁকুনি থামে না। শোক ক্রোধে পরিণত হলে সে কি এমন ভয়ঙ্কর, এত অপ্রতিরোধ্য জিনিস। ঝাঁকুনি আমি থামাতে পারি না।

আমার দু'হাতে ঝাঁকুনির মধ্যে মমতা আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়েছে। আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। পড়ে গেলেই, ধরে নিয়ে ফের ঝাঁকাব বলে।

টলে পড়ে যেতে গিয়ে, না পড়ে, মমতা হঠাৎ গেটের দিকে ছুটল। ওর বুকের আঁচল রাস্তায় লুটোচ্ছে। মাথার ওপর চুড়ো-করা চুল ভেঙে গেছে কখন। জোর উত্তুরে হাওয়ায় প্রেতিনীর চুলের মতো পতপত করে উড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুটে ধরতে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। রাস্তা থেকে একমুঠো মোরাম তুলতে গিয়ে একটা বড়সড় নুড়ি হাতে উঠে আসে। আমি সর্বশক্তি দিয়ে সেগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে মারি। আমার ক্রোধ ও দুঃখের তীব্রতার তুলনায় যথেষ্ট অবজ্ঞাভরে মোরামগুলি মাঝখানে ঝরে গেলেও, গেট থেকে দৌড়ে চৌরঙ্গির দিকে বাঁক নেওয়ার ঠিক আগে, নুড়িটা ওর কোথাও গিয়ে লাগে। মমতা চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ।' আমি শুনতে পাই।

'আমার উদ্দেশে বলা মমতার সেটাই শেষ কথা। অবশ্য কথা কি আর। ধ্বনি। একটা ধ্বনি মাত্র।

১৮। পুনশ্চ

তুমি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ। দ্বিতীয় সঞ্জয়। আমার জীবনের তৃতীয় পুরুষ সম্পর্কে তোমরা দু'জনেই ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

তুমি সেদিন যা করলে, সে জন্যে নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নও। আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তোমার পৌরুষের লেজে দিয়েছি পা। তোমার তো যা খুশি করার অধিকার আছে, তাই না? মান্তুর আত্মহত্যার দায় আমার ঘাড়ে চাপালে। যাতে তোমার অপমানিত পুরুষকার একটা ভাল অজুহাত পায়। শোকের মতো পোক্ত দাঁড়াবার জায়গা রাগের পক্ষে আর কী। সত্যি, সেদিন খুন যে করোনি, আমার তো সেজন্যেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত; তাই না? তবে, তোমার অবগতার্থে জানাই, সঞ্জয় নয়, আমি তোমার জন্যেই তোমার কাছ থেকে সরে এসেছি।

আঠারো-উনিশ বছরে যখন তোমার সঙ্গে বিছানায় উঠি, তখন ছিলাম ছেলেমানুষ। তখন তো কিছুই জানতাম না। তখন ছোঁয়ামাত্র শক্ত হয়ে যেত নিপ্‌ল। পায়ের ডিমগুলোর কাছ থেকে কী যেন উঠে আসত— কামনাই বলি— উরুসন্ধি পর্যন্ত। পজেসড হতে ইচ্ছে হত। এবং হতাম। অস্বীকার করব না, তখন সার্থক লাগত।

কিন্তু তোমার সঙ্গে দিনে দিনে আমিও বড় হয়েছি। আর এটাই তুমি লক্ষ্য করোনি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে, তোমার শরীর-সর্বস্বতা আমার মনে, না মনে নয়— সত্তায়— যে অতৃপ্তি রেখে যাচ্ছে তা তুমি লক্ষ্য করছ না। আমি লক্ষ্য করতে শিখলাম, পৃথিবীর মানুষকে তুমি ভাগ করেছ শুধু দুটি শ্রেণীতে। মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ। তা, শুধু তোমাকে দোষ দিয়ে কী লাভ? অ্যানাটমির বইতেও তো হিজড়েদের কথা লিখতে ভুলে গেছে। তারা মানুষ নয়?

তোমার মধ্যে দিয়ে বড় হতে হতে আমি যে শিক্ষা পেলাম সেটা কী, তা জানো কি? সেটা হল সমস্ত পুরুষ আসলে একটি মূর্তিধারী যৌন-অহঙ্কার মাত্র। অন্তত, মেয়ে ব্যাপারে। আমি একে পজেস করব। আর এ সাবমিট করে ধন্য হবে। দৃষ্টিভঙ্গি একটাই। সঞ্জয়ের সঙ্গে যৌন-অভিজ্ঞতাও আমাকে একই কথা জানাল। যে আমি একজন মেয়েমানুষ। মানুষ নই।

কিন্তু হে আমার জীবনের প্রথম পুরুষ, তোমার কথাই আলাদা। কারণ, তোমার কাছে আমি তো মেয়েমানুষও নই। আমি একটি 'মাল'। ঠিক কিনা? কত না বার আমাকে কাছে টেনেছ ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয়-সম্ভাষণে! তোমার মতে ওই সময় আমাকে মাল-জ্ঞান না করলে তোমার পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হবে না। অবোধ শিশুকে যেভাবে ভোলায়, নির্বোধ মরণাপন্নকে যেভাবে সান্ত্বনা দেয়, সেভাবে এইসব আমাকে বুঝিয়েছ।

ওই সময়ে? সত্যিই কি তাই? তাহলে আমার সঙ্গে মেলামেশার পরেই তুমি পুরুষবন্ধুদের কাছে, মদ্যপানের কাছে অমন অধীর আগ্রহে ছুটে যেতে কেন? তুমি যদি পুরুষদের প্রতিনিধি হও (ঈশ্বর করুন, যেন তা না হয়), তাহলে মানতেই হয় যে আমাদের মেয়েদের কামনা শরীরে যতটুকু ফুটে ওঠে, তোমাদের প্রয়োজন শুধু ততটুকু। যে কামনা তা ফোটায়, তার সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাতে তোমাদের প্রয়োজন নেই।

বেশ্যা বললে সেদিন। আমাকে। বেশ্যাই ভেবেছ। এবং আগাগোড়া। শুধু পুরুষাঙ্গ দিয়ে মনোহীন প্রহার— 'মার শালীকে' ছাড়া আর কোনও জ্ঞানগম্যি কি তোমার তখন থাকত? তুমি বলবে, বলেওছো, তখন আর কিছু থাকার কথা নয়। কিন্তু, বুকে হাত দিয়ে বল তো, হে পুংলিঙ্গ, তারপর সারাদিন, যখন অফিসে, বন্ধুদের সঙ্গে, মদ্যপানে— একবারও কি আমার কথা মনে পড়েছে!

তোমার এই শরীরের মধ্যে আমাকে বেঁধে রাখা, আমি এ থেকেই আমার মুক্তি খুঁজে পেতে চেয়েছি। সঞ্জয় কেউ নয়। সে আর একজন মাত্র। পৃথিবীর সহস্র লক্ষ স্ত্রী-লোক যারা শত মনোমালিন্য, চুলোচুলি আর মারামারির পরেও 'এ-বার আমার হকদার আমাকে নেবে' এই বোধ থেকে ঠ্যাং খুলে দেয় ও দিয়ে ধন্য হয়, ওরে শালা, আমি তাদের একজন হতে চাই না।

জানি, এ-সব তোমাকে বলা বৃথা। কেননা, এটা তুমি মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করেও বুঝে পাবে না যে কেন মেয়েমানুষও একজন মানুষ। এবং কীভাবে।

আমি সঞ্জয়কে বিয়ে করছি না। কেন, সে আর একটা কাহিনী। তোমাকে জানাবার প্রয়োজন দেখি না। তবে, ওহে প্রিয়তম, তোমাকে এটুকু জানাই সন্ন্যাসিনীর জীবন কাটাবার কথা আমি একটুও ভাবছি না। সন্ন্যাসিনী আর হিজড়ে তো একই। কেন না, দু'জনেই প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করছে। সমস্ত সন্ন্যাসিনী ঈশ্বরের চোখে পাপী।

আমি তৃতীয় পুরুষের খোঁজে আছি।

— মমতা সেনগুপ্ত।

পুনশ্চ।। বাবা ও অপর্ণাদির বিয়েতে আমি সম্মতি জানিয়েছি। — ম. ❐

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~